পথ অন্তহীন

পথ অন্তহীন

অমিয় চক্রবর্তী

প্রকাশক
শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সান্যাল এণ্ড কোং
৮৫, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ-পট—সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রক
শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ভারতমিহির প্রেস
৮৫, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা—৯

ব্লক—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

মূল্য ২'৫০ ন. প.

উৎসর্গপত্র

যাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা, পরিশ্রম ও স্নেহপূর্ণ সহানুভূতির ফলে এই বই প্রকাশ সম্ভব হ'ল, তাঁকেই দিলাম।

ভূমিকা

সাহিত্য সাধনা চিরদিনের সাধ। যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না তা' জানি, তবু মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাস সাহিত্যে হস্তক্ষেপ এই প্রথম, দোষগুণ পাঠকসমাজের সমালোচ্য।

সাহিত্যিকের সঙ্গে সাহিত্যরসিকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা আর কতটুকু সম্ভব তবে সাহিত্যের সহায়তায় মানসিক সংযোগ স্থাপিত হ'তে পারে। মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ এক আনন্দলোকের সন্ধান দেয় তাই অপরিচয়ের যবনিকা সরিয়ে দেবার এই প্রয়াস।

লেখিকা।

মহালয়া।

আশ্বিন,

১৩৬৭

গ্রামের ছেলে রঞ্জন আর তার প্রতিবেশিনী গ্রামের মেয়ে লীলা।

'আঃ, উঃ, ও মাগো।'

পাশের ঘর থেকে মা ছুটে এলেন, রুষ্ট কণ্ঠে বললেন 'চেঁচাচ্ছিস কেন? হয়েছে কি? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে।'

'বাঃ, রঞ্জুদা আমার চুল ছিঁড়ে দিয়েছে তা চেঁচাব না? আমার লাগে না বুঝি?'

মা হেসে ফেললেন, বললেন 'কই, দেখছিনে তো তাকে?'

'দেখবে কি, আমার চুলের বেণী ধরে ঝট্‌কা মেরে পালিয়ে গেছে, ডাকাত নয়তো কি?'

বারান্দার ওপাশ থেকে একটা ভাঙ্গা টিন হাতে নিয়ে বাজাতে বাজাতে রঞ্জন প্রবেশ করলো, নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছে মাসিমা?'

লীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'কি হয়েছে মাসিমা, বড় ভাল মানুষটি সেজে এখন বলা হচ্ছে, কি হয়েছে মাসিমা। উঃ, আমার মাথা ধরে গিয়েছে একেবারে।'

মা ডাকলেন 'রঞ্জু, আয় রান্নাঘরে, গোকুল পিঠে করেছি খাবি আয়।'

লীলা সরোষে বললো, 'বাঃ চমৎকার! আবার আদর করে পিঠে খাওয়ান হচ্ছে।'

মাসিমা পেছন ফিরেছেন দেখে রঞ্জন মুখ ফিরিয়ে একটুখানি দুষ্টু হাসি হেসে নারায়ণীর সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বার বছরের রঞ্জন, নয় বছরের লীলা।

লীলা যখন কেবল চল্‌তে বল্‌তে শিখেছে তখন থেকে কনকলতা ঝিকে পাঠিয়ে ওকে বাড়ীতে এনে কোলে কাঁখে নিতেন। একটি প্রচ্ছন্ন আশা তাঁর সারামন জুড়ে থাকতো রঞ্জনের হয়তো এমনি একটি বোন জন্মাবে, ভাসা ভাসা ডাগর চোখ মেলে মধুর হাসিতে তাঁর হৃদয় ভরে দেবে, একটু বড় হলে তার কণ্ঠ-কাকলীতে মুখর হবে এই গৃহ, প্রাসাদের অঙ্গনতল চঞ্চল হবে সেই ছোট্ট মেয়ের নর্ত্তনে; সার্থক হবে তাঁর জীবন, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে তাঁকে দেবে পরিপূর্ণতা।

কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল, রঞ্জন বড় হয়ে গেল তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর কোন শিশু তাঁর কোলে এল না। অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দিনের পর দিন যখন তাঁর আশাহত মনকে বেদনাকুল করে তোলে তখন ছোট্ট লীলাই তার মনের ঝঙ্কারে তার কলকণ্ঠের অজস্র ভাষণে সারাবাড়ি মুখরিত করতে থাকে আর অজানিতে অনেক কামনার ধন কন্যার রূপ নিয়ে দিনে দিনে কনকলতার সারাহৃদয় জুড়ে বসে।

কনকলতা নিজে বসে লীলাকে খাওয়াতেন, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে দিতেন, চোখে কাজল টেনে, টিপ পরিয়ে দিয়ে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঘেরা মুখখানি তার তুলে ধরে অতৃপ্ত চোখে দেখ্‌তে থাকতেন, তারপর একসময়ে না জানি কি ভেবে তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠতো। সাত বছরের রঞ্জন চার বছরের লীলাকে খেলার সাথি করে নিয়েছিল, ওদের দুজনের খেলা দেখতে দেখতে এক মধুর কল্পনায় তাঁর সারা মন অনির্ব্বচনীয় সুখে পুলকিত হয়ে উঠতো।

লীলা অজ্ঞাত শৈশবে পিতৃ-হারা। গ্রামের স্কুলে তার বাবা মাষ্টারি করতেন। লীলার মা কনকলতাকে বল্‌তেন, আচ্ছা দিদি, এই গরীবের মেয়েকে আপনি রাত দিন এত ভালো ভালো পোষাকে সাজিয়ে রাখেন বড় হয়ে ও যখন আর খারাপ কাপড় জামা পরতে চাইবে না তখন আমি কি করব বলুন তো ?

কনকলতা হেসে উত্তর দিতেন, তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবেনা ভাই, আমি যদি মরেও যাই, লীলার জামা কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করে যাব।

নারায়ণী যদিও জানতেন জমিদার পরিবারের একমাত্র ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে লীলার বিয়ে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় তবু লীলা একটু বড় হতেই কি জানি কেন এই অসম্ভবের স্বপ্ন তাঁর মনকে দোলা দিত। পরমুহূর্ত্তেই নিজের মনকে তিনি শাসন করে বলতেন, গরীবের মেয়ে লীলার এ সৌভাগ্য পাগলের কল্পনা

ছাড়া কিছুই নয়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন লীলার মন কখনও যেন এ আকাশ-কুসুম রচনার অবকাশ না পায়, তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে তার জীবন, অসহনীয় সে দুঃখ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। দুরাশাকে মন থেকে মুছে দাও, মনকে শক্তি দাও ভগবান !

আগেকার কথা

পলাশপুরের জমিদার গোলকনাথ চৌধুরী বিপুল বিত্তশালী জমিদার। নবাবী আমলে তাঁর কোন পূর্ব্বপুরুষ নবাব সরকারের কোন প্রিয় কাজ করে পুরস্কার স্বরূপ খেতাব সহ কয়েকখানা পরগনার মালিকি সত্ব লাভ করেন, বংশানুক্রমে এখনও তাঁরা সেই খেতাব ও বিষয় সম্পত্তি ভোগ করে আসছিলেন। প্রকাণ্ড বিস্তৃত তাঁর প্রাসাদ, নানা পরিজনে পরিপূর্ণ তাঁর সংসার, সেরেস্তায় আমলা, গোমস্তা, বাহিরে পাইক বরকন্দাজের ভিড়, বারমাসে তের পার্ব্বনে বিরাট সমারোহ।

গোলকনাথের সহধর্ম্মিনী রাজলক্ষ্মী তখন গৃহিণীত্বে সু-প্রতিষ্ঠিতা। অন্তঃপুরে আশ্রিতা আত্মীয়া, ঝি চাকরাণীর উপর তাঁর অসীম প্রভাব, নানারকমের প্রার্থীর প্রার্থনায় সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত, লোকের অভাব পূরণেও তিনি মুক্তহস্ত।

এই সময়ে বধূরূপে সংসারে এলেন কনকলতা। শ্বাশুড়ী ক্ষীণাঙ্গী বধূকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন 'আ মরি,

মরি, কনকলতাই বটে।' সমবেত আত্মীয়াদের সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা আমার রাজুর বউকে কেমন দেখছো?' সমস্বরে সবাই বললো, এমন রূপ তারা কখনও দেখেনি।

আনন্দে আর গর্ব্বে গৃহিণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জমিদার গোলকনাথ চৌধুরীর দিনে দিনে আরও বৈষয়িক উন্নতি হতে লাগলো, লোকে বললো স্বশরীরে মা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে। এর কয়েক বছর পরে কনকলতার কোলে যখন শিশু জাতক এল তখন ঢাক ঢোল রশোন-চৌকির বাজনা শুনে সাতখানা গাঁয়ের লোক জানলো যে চৌধুরী বংশের ভাগ্যবান উত্তরাধিকারী পৃথিবীর আলোয় চোখ মেললো।

পাশের গ্রামের রায়েদের তখন পড়তি অবস্থা। এক সময়ে তাঁরাও সম্পন্ন ছিলেন, সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সেই পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকেই অবস্থার ভাঙ্গনে এঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে চৌধুরীদের এষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এখন দেশের বাড়ীতে বড় কেউ নেই। বহু বিস্তৃত রায় পরিবারের ছেলেরা জীবিকার সন্ধানে দেশ দেশান্তরে চলে গেছে, কেউ বা কলিকাতা মহানগরীর দ্বারস্থ হয়েছে। একমাত্র নিঃসন্তান জগমোহন রায় প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন ভাঙ্গাচোরা বাড়ীটাকে ত্যাগ করে যেতে পারেননি, তিনি ও তাঁর স্ত্রী হৃত-গৌরব গৃহে অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন।

একদিনের কথা

ঘটনাটা ছোট যা সাধারণতঃ ঘটে থাকে কিন্তু এই সামান্য ঘটনা থেকে যে অসামান্যের উৎপত্তি হল তা বিস্ময়কর।

পলাশপুরের জমিদার গোলকনাথ চৌধুরীর খাস প্রজা ব্রজ বাগদীর বৌ একদিন কলমীশাক তুলতে পাশের গাঁয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি গ্রাম কিন্তু পুকুরটা চৌধুরীদের সম্পত্তি নয়, এটা রায়েদের জমিদার বাড়ীর পুকুর। পুকুরটা বেশ বড়। এক সময় যখন রায়েদের পূর্ব্বপুরুষরা এর জল ব্যবহার করতেন তখন এর জল কাঁচের মত স্বচ্ছ ছিল। পুরুষদের আর মেয়েদের আলাদা স্নানের বাঁধান ঘাট এখনও আছে কিন্তু সংস্কারের অভাবে মেয়েদের ঘাটের প্রাচীরগুলোর ইঁট খসে খসে পড়ছে, পুকুরের জল শেওলায় আর কল্‌মীর জটিল জঙ্গলে আচ্ছন্ন। বড় বড় বট অশ্বত্থের ছায়া সমাচ্ছন্ন পুকুর রৌদ্রের স্পর্শ বড় পায় না, গ্রামের লোকের ধারণা এ জল বড় ভারি, এর জলে স্নান করলে ম্যালেরিয়া ধরে। তাই তারা স্নানে পানে এ জল ব্যবহার করে না, এখন এখানে ধোপারাই কাপড় কাচে।

সন্ধ্যা আসন্ন

পুকুরের পাড়ে নেমে বাগদীবৌ একাগ্রমনে নধর কল্‌মী শাকগুলি তুলে কোঁচড় ভরছিল, প্রকাণ্ড পুকুরের অন্য প্রান্তে ঝাঁকড়া বটগাছের অন্ধকার ছায়ায় ভাঙ্গা সিঁড়ির উপরে রাখু

ধোপা যে তার ধোয়া কাপড়গুলি বোঁচকায় বেঁধে তুলছিল তা সে লক্ষ্য করেনি।

বেজো বাগদীর বৌ যুবতী মেয়ে। কাপড়ের বোঁচকা রেখে রাখু আস্তে আস্তে পুকুর পাড়ে উঠে এল। কিসের একটা শব্দ শুনে মুখ তুললো বাগদীবৌ, সভয়ে দেখলো আসন্ন সন্ধ্যায় পুকুর পাড়ে একমাত্র রাখু ছাড়া আর কেউ নেই।

কোঁচড়ের শাক ফেলে দিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো মেয়ে, ভাঙ্গা চোরা আলের পথ ভেঙ্গে পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় সে ছুটতে লাগলো কিন্তু বৃষ্টিভেজা পাটের ক্ষেতে বেশীদূর যেতে পারলো না, পা পিছলে পড়ে গেল।

অনেক সন্ধানের পরে গভীর রাত্রে পাটের ক্ষেত থেকে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাগদীরা উদ্ধার করে নিয়ে গেল, ঘটনা সব জানলো। সারা বাগদীপাড়া আগুন হয়ে উঠলো, অপরাধীর শাস্তি চাই। পরদিন জমিদার গোলক নাথের কাছে নালিশ গেল, অপরাধীর শাস্তি চাই, অন্যায়ের প্রতিকার চাই।

প্রতিবেশী জমিদারের কাছে গোলক নাথ প্রতিকারের দাবী করলেন কিন্তু তার উত্তরে রায়েরা বলে পাঠালেন, সব মিথ্যে কথা, ব্যক্তিগত শত্রুতার ফলে এ ঘটনা সাজানো হয়েছে।

বাগদীদের পূর্ব্বপুরুষেরা চৌধুরীদের লেঠেল ছিল। বর্ত্তমান যুগে আর লেঠেলের প্রয়োজন নেই আইনই এখন রক্ষাকর্ত্তা তাই বাগদীরা আজকাল শিষ্ট শান্ত ভাবেই ঘর বেঁধে সংসার

করে। কিন্তু এ ঘটনায় তাদের ধমনীতে পূর্ব্বপুরুষের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো। ঘরের বৌয়ের অমর্য্যাদায় সারা বাগদীপাড়া অপমানে উন্মাদ হয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে রাখু ধোপার বাড়ীতে তারা আগুন লাগিয়ে দিল। শুধু একখানা বাড়ী নয়, গ্রামবাসীরা সতর্ক হবার অবসর পেলনা, গভীর রাত্রের অতর্কিত আক্রমণে গোটা গাঁ খানাই প্রায় পোড়া মাঠ হয়ে গেল, রায়েদের পাকা বাড়ীর গায়েও কিছু আঁচ লাগলো।

তারপর দ্বন্দ্বযুদ্ধ! ছোরা, লাঠি, বর্শা, কীরিচ, খুন, জখম। দুই পক্ষেই হতাহত হলো। পুলিস এসে আসামীদের কয়েক জনকে ধরে নিয়ে গেল। ফৌজদারী মামলা দায়ের হলো চৌধুরীদের নামে। বাদী পক্ষ আর্থিক সঙ্গতিতে হীন, পোড়া-মাটির গ্রাম অভিযোগ আনলো যে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষ তাদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, দুর্দ্দান্ত লেঠেলদের অত্যাচারে তাদেরই জীবন হানি ঘটেছে। সাজানো সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, স্বয়ং গোলক নাথ বন্দুক হাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মামলা জটিল অবস্থায় দাঁড়াল, মহকুমা, জেলা, তারপর হাইকোর্টে মামলা উঠলো। * * * *

দুই বছর ধরে মোকর্দ্দমা চললো, জলের মত অর্থ ব্যয় হতে থাকলো। জমিদার গোলক নাথ চৌধুরী অর্থের দম্ভে দুর্ব্বল প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যাচার করেছেন মামলার শেষে তাই প্রতিপন্ন হল।

জমিদার গোলক নাথ চৌধুরীর সম্মান রেখে কোর্ট তাঁকে জামিনে খালাস দিয়েছিল্, কিন্তু তিনি নিজের প্রাসাদ কক্ষেই কারাযন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। একদিনের কারাদণ্ড ভোগ করে ও বিপুল পরিমাণ অর্থদণ্ড দিয়ে তিনি পরিত্রাণ পেলেন বটে কিন্তু অপমানের জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না, এই আঘাতে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। এই সময়ে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটলো, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী এই দারুণ দুর্দ্দিনে তাঁকে ফেলে পরলোকে চলে গেলেন।

মামলার খরচে জমিদারী সবই প্রায় নীলামে উঠেছিল। শেষ সময়ে ছেলের হাত ধরে জলভরা চোখে গোলক নাথ বললেন, রাজীব, ভাগ্যের দোষে তোকে সর্ব্বস্বান্ত করে রেখে গেলাম, কিন্তু একটা কথা তোকে বলে যাচ্ছি অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নিচু করিস্‌নে, তোকে দিয়ে যেন চৌধুরী বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। আর—আর আমার রঞ্জনের জন্যে তো কিছুই রইলো না, রইলো শুধু আমার আশীর্ব্বাদ, যেন মানুষ হয়।

*

পূজোর ঘরের দরজার কাছে নিঃশব্দে বসে লীলা পূজো দেখছিল, কনকলতা পূজোয় বসেছিলেন। একটু পরেই তিনি বলে উঠলেন 'ও লীলা, ঘি টা বার করে দিয়ে আয়তো মা, ভুল হয়ে গেছে। পূজোয় বসেছি আমি তো এখন উঠতে

পারবো না।' এই বলে ঝণাৎ করে চাবির গোছাটা দরজার কাছে ফেলে দিলেন, লীলা চাবি নিয়ে বেণী দুলিয়ে ছুটলো। ঘি বার করে এনে ঠাকুরকে দিয়ে বললো 'নাও হরিদা, মা-মণি বার করে দিতে বললেন।'

ঠাকুর হেসে বললো 'দিদিমণি আমাদের পাকা গিন্নি হয়ে গেছে।'

'বা রে, হবো না, আমি ছোট বেলা থেকেই এ সব মা-মণির কাছে শিখেছি যে। আচ্ছা হরিদা, তুমি এত ভালো ভালো রান্না কার কাছে শিখেছো?'

'সেও ওই মায়ের কাছেই দিদিমণি, মা আমার অন্নপূন্নো, কত রকম বেরকমের রান্নাই যে জানেন, আমি অত মনে রাখতেও পারিনে। তবে মজার কথা শুনবে দিদিমণি, মায়ের বিয়েতে আমিও যে বরযাত্তির গেছলুম, তখন আমার সবে পৈতে হয়েছে। রাজাবাবু ছেলের বিয়েতে গাঁয়ে আর লোক রাখেন নি, গাঁ সুদ্ধু বরযাত্তির হয়ে গিয়েছিল, দেখে তো কন্যে পক্ষের চক্ষু থির। কর্ত্তাবাবু বললেন, গোধূলি লগ্নে বিয়ে, বরযাত্তির সব আমার বাড়ীতে ফিরে গিয়ে খাবে, আমরা শুধু মা লক্ষ্মীকে তুলে ঘরে নিয়ে যাব, কুশণ্ডিকা আমার বাড়ীতেই হবে। সত্যি তাই, সন্ধ্যেবেলা বিয়ে হয়ে গেল সবাই মিলে মা লক্ষ্মীকে তুলে নিয়ে আমরা ঘরে ফিরে এলুম।'

আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে লীলা একখানা পিঁড়ে টেনে বসে পড়লো, বললো 'আরো গল্প বল হরি দা। তারপরে কি হলো?'

হরিহর বললো, 'তারপর আর কি, মা লক্ষ্মীর নিজের আসনে পিতিষ্ঠে হয়ে গেল। মায়ের আগমনের পর থেকে সংসার যেন উথ্‌লে উঠলো, নতুন নতুন জমিদারী কেনা হতে থাকলো, গিন্নিমা বলতেন, বৌমা আমার পয়মন্ত, মা লক্ষ্মীকে আঁচলে বেঁধে এনেছে। দোল দুগ্‌গোচ্ছবের ঘটা বেড়ে গেল, পূজোর তিনদিন অতিথ্‌ পথিক, দুঃখী কাঙ্গালী কেউ ফিরতো না, দেশে ধন্যি ধন্যি রব পড়ে গেল।'

পূজো শেষ করে বেরিয়ে এসে কনকলতা ডাকলেন, 'লীলা, কই কোথায় গেলি তুই আমার চাবিটা দিলিনে, হারিয়ে ফেলবি নাকি?'

তাড়াতাড়ি হাতাটা হাতে নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হরিহর বলে উঠলো 'ওই যাঃ ডালটা ধরে গেল বুঝি, মা এখুনি বক্‌বে।'

লীলা মুখ ঘুরিয়ে বললো 'হ্যাঁঃ, মা যেন কতই সবাইকে বকে, মিছে কথা বলো না হরিদা।'

হরিহর হেসে ফেলে বললো, 'মিছে কথাই দিদিমণি।'

লীলা উঠে কনকলতার কাছে গেলে তিনি বললেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'হরিদার কাছে তোমার বিয়ের গল্প শুনছিলাম মা-মণি।'

কনকলতা হাসতে হাসতে বললেন 'তাই তো বলি মেয়েটার সাড়া নেই কেন? হরি ঠাকুর তো গল্প করতে ওস্তাদ।'

'আচ্ছা মা-মণি, তুমি হরিদাকে হরি ঠাকুর বল কেন?'

কনকলতা বললেন 'ওরে ওকি আজকের লোক, আমার শ্বশুরের আমল থেকে এখানে কাজ করছে। আমি বিয়ে হয়ে এসেই ওকে এ বাড়ীতে দেখেছি, পুরনো লোকের মান্য রেখে কথা কইতে হয়। আচ্ছা আমার চাবিটা কোথায় ফেল্‌লি ?'

ডুরে শাড়ীর আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা তুলে ধরে লীলা বললো, 'এই যে তোমার চাবি।'

কনকলতা হেসে বললেন 'বাঃ, খুদে গিন্নির আঁচলে চাবির গোছা তো বেশ মানিয়েছে, কিন্তু তোর ওজনের চেয়ে যে চাবির গোছার ওজনটাই বেশী হবেরে!' এই বলে হাত বাড়িয়ে লীলাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

বিকেল বেলা রোদ পড়ে আসছে, দরদালানের বারান্দায় বসে কনকলতা ঠাকুর ভোগের চাল বাচ্‌ছিলেন, ক্ষেমঙ্করী চিরুণী দিয়ে তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। কনকলতা বলে উঠলেন 'সর্‌ বাছা, আমার আর বুড়ো বয়েসে চুল বাঁধতে হবে না, ঢের হয়েছে।'

ক্ষ্যামা মিনতির স্বরে বললো 'এই হয়ে গেছে মা, এতখানি একঢাল চুল না বাঁধলে গরমে টেঁকতে পারবে না।'

কনকলতা আপত্তি করতে লাগলেন 'এত বড় ছেলে মেয়ের সামনে আমার চুল বাঁধতে লজ্জা করে, ক্ষ্যামা তুই ছাড় দেখি আমায়।'

এই সময়ে ঝড়ের মুখে পাখীর মত ছিট্‌কে এসে লীলা

পেছন দিক থেকে কনকলতাকে জড়িয়ে ধরলো, কনকলতা বাঁ হাত দিয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে রে ?' মুখ তুলতেই রঞ্জনকে দেখে বললেন, 'ও, তুই বুঝি ওকে তাড়া করেছিস ? বুড়ো ছেলে সব সময় কেবল হুটোপাটি আর উৎপাত করা।' তারপর লীলার বুকের উপর হাত রেখে বললেন, 'ভয়ে মেয়েটার বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে, যা, পালা এখান থেকে।'

রঞ্জন রেগে বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয় পাবার মেয়েই কিনা তোমার, আমার চুল ধরে টেনে দিয়ে পালিয়ে বাঁচলো তোমার কাছে, একবার পেলে আমি শোধ না নিয়ে ছাড়ছিনা।'

কনকলতা হেসে ফেললেন, বললেন, 'খবরদার রঞ্জু, ওর চুল ধরে যদি টানিস তবে মজা দেখ্‌বি। ছেলেদের ছোট চুলে লাগেনা, মেয়েদের লম্বা চুলে বড্ড লাগে।'

রঞ্জন আরও চটে গিয়ে বললো, 'নাঃ, ছেলেদের লাগেনা, ছেলেরাতো মানুষ নয় লোহা দিয়ে তৈরী, আর ওরাই মানুষ ওরা মাখন দিয়ে তৈরী না ? যত তোমার এক চোখোমি।' এই বলে দুম্‌দাম করে পা ফেলে সে বাহিরে চলে গেল।

চোদ্দ বছরের ছেলে রঞ্জন আর এগার বছরের মেয়ে লীলা। কিন্তু রাজীব লোচন এতটা পছন্দ করতেন না, গৃহিণীকে মাঝে মাঝে বলতেন, 'আচ্ছা, মাষ্টারের মেয়েটা সব সময় তোমার পায়ে পায়ে ঘোরে কেন বলতো ?'

কনকলতা উত্তর দেন, 'তুমি ওরকম করে বলোনা, ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি তাই; কিন্তু তাতে তোমার এত আপত্তি কেন বলতো? আমার মুখের দিকে চায়, সব সময় আমার হাতে সঙ্গে কাজ করে, পেটে তো আর একটা মেয়ে ধরিনি যে মায়া মমতা করবে।' কনকলতার চোখ জলে ভরে আসে।

কর্ত্তা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তার জন্যে ভাবো কেন, ছেলেতো পেটে ধরেছো, রঞ্জু তোমার পনের বছরে পা দিলো আর দু'চার বছরের মধ্যেই ওকে বিয়ে দিয়ে তোমার মনের মত একটি মেয়ে আমি এনে দেবো।'

কনকলতা মুখ নীচু করে থাকেন। কর্ত্তা বলেন, 'কথা বলছো না যে?' কনকলতা নতমুখেই বলেন, 'লীলার মত মেয়ে কি আর পাবো? ও আমাকে মায়ের মত ভালো বাসে, অচেনা ঘর থেকে এসে রঞ্জুর বৌ কি আমাকে অম্‌নি করে ভালবাসতে পারবে?'

রাজীবলোচনের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়, কঠিন স্বরে তিনি বলেন, 'ও কথা তুমি যেন আর একদিনও আমার কাছে উচ্চারণ কোরোনা, আমার মনের ভাব তুমিতো জানো।'

ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে কর্ত্তা কাছারী বাড়ীতে চলে যান।

'গল্প বলনা হরিদা।' রান্নাঘরে পিঁড়ে টেনে নিয়ে লীলা বসে পড়লো। ভাতের হাঁড়িটায় হাতা দিয়ে হরিহর বললো, 'দাঁড়াও দিদিমণি, এই ভাতের মাড়টা ছেঁকেনি।'

লীলা ধৈর্য্য ধরে বসে থাকবার মেয়ে নয়, ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো, 'আঃ হরিদা, তোমার হাতের কাজ আর শেষ হয় না।'

হরিহর হেসে বলে, 'কাজ কি কারু জীবনেও শেষ হয় দিদিমণি, তা' কিসের গল্প বলব বলনা ? রাজাবাবুর শিকারের গল্প শুন্‌বে ?'

'সে আর একদিন শুনবো এখন, তুমি এখন মা-মণির বিয়ের গল্প বলো।'

হরিহর বলে, 'ও, সেই গল্প, আচ্ছা তবে বলি শোন। সাত দিন ধরে নবোত খানায় রসুন-চৌকি বেজেছিল। সারা গাঁয়েই যেন উচ্ছব লেগেছে ঘরে আর কারু মন টেঁকে না, ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সব চব্বিশ ঘণ্টাই জমিদার বাড়ীতে হাজির ; আর খাওয়া দাওয়ার কি ধুম। তারপর অষ্ট মঙ্গলের দিন মা যোড়ে বাপের বাড়ী গেলেন, সেইদিন তবে নবোত খানার বাজনা থামলো, কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল।

কর্ত্রী ঠাকরুণ বললেন, ওরে যেখানে যে দুঃখী কাঙ্গালী আছে সবাইকে ডেকে আন, আমার অন্নপূন্নোর অন্নছত্তর থেকে কেউ যেন শুকনো মুখে না ফেরে।

গাঁয়ের ভিকিরি কাঙ্গালীরাই গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দিল, সে কী ভূরি ভোজের ব্যাপার ! কুটুম স্বজন, আনা নেওয়ার যে যেখানে ছিল কেউ আর বাদ যায়নি, আর তা ছাড়া বাড়ীতেই তো সেকালে বারমাস এক এক বেলায় একশো খানা পাত পড়তো। ছেলেপিলের কান্নাকাটি, হৈ চৈ আর বড়দের

চেঁচামিচিতে মাথা খারাপ হবার যোগাড়, মনে হত বাড়ী ছেড়ে পালাই।'

লীলা খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর বললো, 'আচ্ছা, অত লোকজন সব কোথায় গেল হরিদা ?'

হরিহর উত্তর দিলো, 'তারা সব সুখসন্ধানী সুখের পায়রা দিদিমণি, সুসময়ে সুখ করলো অসময়ে যে যেদিকে পারে সব উড়ে চলে গেল।'

'আচ্ছা, তুমি যে সেদিন বলেছিলে বিজয়ার দিন সোনার ঝালর দেওয়া হাওদার ওপরে হাতীর পিঠে মা-মণিকে বসিয়ে ভাসান দেখতে নিয়ে যাওয়া হত, তা' সে হাতীটা কোথায় গেল হরিদা ?'

হরিহরের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এল। এবার হরিহর ভয়ানক ব্যস্ততা দেখিয়ে বল্‌লো, 'আর এখন গল্প নয় দিদিমণি লক্ষ্মীটি, রান্না না হলে মা আবার বকবে।'

শাসনের সুরে লীলা বললো, 'রোজ মিছে কথা ? মা-মণি কাউকে কক্‌খনো বকে না।'

লীলা উঠে আসছিল, পথে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা। বল্‌লো, 'রঞ্জুদা, বুড়ো আমগাছে ছোট ছোট গুঁটি হয়েছে, চলনা লক্ষ্মীটি পেড়ে আনি, দুজনে নুন দিয়ে খাব। আমি রান্না ঘর থেকে খানিকটে নুন নিয়ে এসেছি এই দেখ।' বাঁ হাতের মুঠো খুলে সে দেখাল।

উৎসাহিত হয়ে রঞ্জন বললো, 'চল্‌, কিন্তু বাবাকে লুকিয়ে

যেতে হবে, বাবা যদি দেখতে পান যে এখন পড়া ছেড়ে উঠেছি তা হলে খুব বকুনি খাব। খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরুতে হবে।'

ফাল্গুন মাস, আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, কোন কোন গাছে কচি আম দেখা যায়। দুজনে আমবাগানে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে কচি আম পেড়ে মনের আনন্দে গাছতলায় বসে তার সদ্ব্যবহার করছিল এমন সময় ক্ষ্যামা এসে ওদের দেখে বলে উঠলো, 'ও মাগো, তোমরা দুটিতে এখানে এই কাণ্ড করছো আর ওদিকে কত্তাবাবু দাদাবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বই পত্তর টেবিলের ওপর রেখে পালিয়ে এসেছ বুঝি?'

রঞ্জন বললো, 'এই যাঃ, যা ভেবেছি তাই। লীলা তুই থাক্ আমি যাচ্ছি।' এই বলে হাতের নুন ঝেড়ে ফেলে কোমরে বাঁধা কোঁচড়ের কাপড়ে মুখ মুছে রঞ্জন ভালো মানুষটির মত রাজীবলোচনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

রাজীবলোচন গম্ভীর মুখে বল্‌লেন, 'রঞ্জু, পড়ার দিকে তোমার একটুও মন নেই, পড়তে পড়তে উঠে পালাও, সামনে ইয়ারলি পরীক্ষা তা' মনে থাকেনা কেন?'

রঞ্জন কোন উত্তর দেয় না, মুখ নীচু করে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে।

রাজীবলোচন বেরিয়ে আসতেই লীলাকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'লীলা, এখন বাড়ী যাও, রঞ্জুর পড়া নষ্ট কোরো না।'

লীলা বিষণ্ণ মুখে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

রাজীবলোচন অন্দরে গেলেন। কনকলতা বঁটিতে বসে কুটনো কুটছিলেন রাজীবলোচনকে দেখে বললেন, 'তুমি ওই মোড়াটাতে বসো, আমি কুটনোটা গুছিয়ে দিয়ে আসি তারপর তোমার কাপড় জামা বার করে দেবো। রঞ্জুটা কি করছে, ওরওতো নাইবার সময় হয়ে এল।'

রাজীবলোচন বললেন, 'রঞ্জু তোমার এতক্ষণ আমবাগানে ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ছিল। দেখো লতা, তোমাকে একটা কথা বলি, এদের তুমি বড় বেশী প্রশ্রয় দাও। লীলা বড় হয়েছে ছেলেদের সঙ্গে অত হুটোপাটি কেন? আর রঞ্জুটাও পনের বছরে পা দিলো, কোন বুদ্ধিসুদ্ধি হলো না, এখনও ছেলেমানুষ আছে। পড়া শোনার দিকেতো মোটেই ঝোঁক নেই, কোন রকমে ক্লাসে উঠছে বটে কিন্তু ষ্ট্যাণ্ড করতে পারে না, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কি করবে জানিনা। তুমি দুজনকেই একটু শাসন কোরো।'

কনকলতা একটু হেসে বলেন, 'কতই আর বড় হয়েছে, ছেলেমানুষরা একটু হুটোপাটি করেই থাকে। যখন বড় হবে তখন নিজেরাই বুঝতে পারবে শাসন করতে হবে না।'

রাজীবলোচন বিরক্তভাবে বলেন 'দুচার ঘণ্টাও কি লীলা নিজের বাড়ীতে থাকবে না, চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে থাকবে? ওর বিধবা মা একা সব কাজ করেন, এতবড় মেয়ে সাহায্য করবে না?'

কনকলতা বলেন 'ওর মা একলা মানুষ, কাজই বা কি, নিজের যা' একটুখানি রান্না তাকি ওই ছোট মেয়ে পারে ?'

উষ্ণ হয়ে কর্ত্তা বলেন, 'যা খুসী করো কিন্তু এর ভবিষ্যৎ ভালো নয় তা বলে রাখছি।' এই বলে কর্ত্তা উঠে চলে গেলেন।

সকাল বেলা। ছোট্ট ফুলের সাজি হাতে নিয়ে লীলা বাগানে পূজোর ফুল আনতে যাচ্ছিল। পড়ার টেবিল থেকে আড় চোখে দেখ্‌তে পেয়ে রঞ্জন টেবিল ছেড়ে উঠবার জন্যে উস্‌খুশ করছিল কিন্তু বাবার কথা মনে পড়াতে জোর করে চোখ ফিরিয়ে এনে বইতে মন দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। পড়াতে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না, একলাইন বারে বাঁরে পড়ছে আর ফিরে ফিরে চাইছে, যা' পড়ছে তার একবিন্দুও বোধগম্য হচ্ছে না। শেষে দুত্তোর বলে রাগ করে বই ছেড়ে উঠে পড়লো, পা টিপে টিপে এসে পরীক্ষা করতে লাগলো বাবা কোথায়, যখন বুঝতে পারলো যে তিনি অন্দরে নেই তখন দৌড়ে এসে লীলার হাত থেকে ফুলের সাজি কেড়ে নিয়ে ছুট্, তারপর খানিক দূরে গিয়ে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলো।

লীলা অনুনয় করে বললো 'দাও রঞ্জুদা লক্ষ্মীটি, মা-মণির পূজোর বেলা হয়ে যাবে।'

রঞ্জন মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললো, 'ভালই হবে, তুই খুব বকুনি খাবি।'

লীলা গর্ব্বিত স্বরে বললো 'মা-মণি আমাকে কক্‌খনো বকে না।'

রঞ্জন ক্ষুণ্ণমনে উত্তর দিলো, 'তা সত্যি, যত রাগ আমার ওপর, তুই হাজার দোষ করলেও কিছু না। এমন হিংসুটে মা আমি জন্মে দেখিনি।'

লীলা চেঁচিয়ে উঠলো, 'রঞ্জুদা, তুমি মা-মণিকে যা' খুসী তাই বলবে, না? আচ্ছা দাঁড়াও আমি এখ্‌খুনি মা-মণিকে বলে দিচ্ছি।'

মুখ ভেংচে রঞ্জন বললো, 'মা-মণিকে বলে দিচ্ছি। যা, বলগে যা, তোর তো শুধু ওই বিদ্যে, নালিশ, নালিশ, নালিশ। ভেবেছিলাম উঁচু ডাল থেকে রক্ত জবা পেড়ে দেব, তা আর দিচ্ছি না। যা, নিয়ে যা তোর ফুলের সাজি, চাইনে।'

সাজিটা ছুঁড়ে দিয়ে রঞ্জন পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিল পেছন থেকে লীলা বিজ্ঞজনোচিত সুরে বললো, 'তুমি কিচ্ছু জানো না রঞ্জুদা, মা-মণি বলেছে নারায়ণের পূজোতে রক্ত জবা লাগে না।'

রাগে জ্বলে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে রঞ্জন বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, তুই ভারি পণ্ডিত হয়েছিস, সব কিছু শিখে নিয়েছিস্ আমি মুখ্যু আছি বেশ, তোর তাতে কি?' লীলা কিছু না বলে আস্তে আস্তে ফুলের সাজিটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। রঞ্জনের পড়াশোনা সব ভেস্তে গেল, সে টেবিল থেকে টাইম্‌পিস্‌টা নামিয়ে নিয়ে তা' খুলে মেজের উপরে তার কলকব্জা পরীক্ষা করতে বসলো, তাইতো, ঘড়িটা কি করে

ঘণ্টা মিনিট বুঝে বুঝে ভালো ছেলের মত ঠিক ঠিক চলে, ওর ভেতরে কি আছে তা' দেখতে হবে।

দুপুর বেলা খাবার পরে রাজীবলোচন নিজের শোবার ঘরে খাটের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, কনকলতা ঘরে এলেন।

কর্ত্তা বললেন, 'আজ তোমায় একটা ভালো খবর দেবো লতা।'

কনকলতা কাছে এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, 'কি বলবে ?'

'হাসিমপুর মৌজাতে এবার আদায় খুব ভালো হয়েছে, হাতে কিছু টাকা এলে ভাবছি রামপুরের তালুকখানা কিনে ফেলব।'

কনকলতা বললেন, 'বেশ তো।'

রাজীবলোচন আবার বললেন, 'যেমন করে হোক্ রঞ্জুকে বিয়ে দেবার আগে নষ্ট সম্মান কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে হবে নইলে ভালো ঘরের মেয়েকে ঘরে আনবার আশা করতে পারবো না।'

কনকলতা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রইলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবে ?'

কর্ত্তা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'বল, কি বল্‌তে চাও।'

কনকলতা বললেন, 'রঞ্জু লীলাকে যে কত ভালবাসে, ওদের মধ্যে যে কত মিল তা কি তুমি দেখ্‌তে পাওনা ? আর কোন মেয়েকে বিয়ে করলে কি রঞ্জু সুখী হবে ?'

হো হো করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কর্ত্তা বললেন, 'পনের বছরের ছেলে আর বারো বছরের মেয়ের আবার ভালোবাসা, ও সব নভেলের ভালোবাসায় আমি বিশ্বাস করিনে। সামনের বছর ম্যাট্রিক দিয়ে রঞ্জু যখন কলকাতায় পড়তে চলে যাবে তখন এ সব ছেলে খেলার কথা আর তার মনে থাকবে না।'

কনকলতা নীরবে নত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কর্ত্তা এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দেখো লতা, তুমি এ কথা কখনও ভুলোনা যে লীলার ঠাকুরদাদা আমাদের বাড়ীতে গোমস্তা ছিল। গোমস্তার নাতনীকে, সামান্য এক গ্রাম্য মাষ্টারের মেয়েকে জমিদার বংশের ছেলে কখনও বিয়ে করতে পারে না। তুমি যদি তাই চাও তবে সে অপমান মাথা পেতে নেবার আগে আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব।'

একটু খানি থেমে রাজীবলোচন আবার বললেন, 'আমার আরও কথা বলবার আছে। লতা, তোমাকে আমি চিনি। তুমি শান্ত প্রকৃতি, তুমি বুদ্ধিমতী কিন্তু ভেতরে ভেতরে তুমি ইস্পাতের মত শক্ত। কাজেই আমি তোমাকে যতই বোঝাই না কেন তোমার মন তা' গ্রহন করবে না, তুমি বাইরে যতই বাধ্যতা দেখাও না কেন তোমার মন কিছুতেই আমাকে সমর্থন করবে না তা' আমি জানি। তাই আজ তোমাকে আমি একটা কথা বলবো যা' আমি এতদিন কারু কাছে প্রকাশ করিনি।

লীলার যখন জন্ম হয় তখন তার বাবা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ছিল, তুমি বোধহয় শুনে থাকবে যে ওর জন্মের দিন কয়েক পরেই সে মারা যায়। এ সম্বন্ধে আমি কোনদিন কারু সঙ্গে আলোচনা করিনি যে পাছে এ নিয়ে গোলমাল হয়, পাছে ভবিষ্যতে লীলার কোন বিয়ের সম্বন্ধ এলে ভেঙ্গে যায়। গ্রামের লোকে অনেকে এ কথা জানে, অনেকে হয়তো ভুলেও গেছে কিন্তু আমি ভুলিনি।

এই মেয়ের সঙ্গে তুমি রঞ্জনের বিয়ে দিতে চাও, তুমি না ওর মা? ভগবান না করুন কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এই মেয়ের বা তার পেটের সন্তানের—' রাজীবলোচনের কথা শেষ না হতেই দুই হাতে কান ঢেকে কনকলতা কম্পিত দেহে ধীরে ধীরে মেঝের উপর বসে পড়লেন তারপর আস্তে আস্তে সেই মেঝেতেই লুটিয়ে পড়লেন।

লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে এসে তাঁকে দুইহাতে তুলে নিলেন রাজীবলোচন, নিজ মনেই বলতে লাগলেন, 'এর প্রয়োজন ছিল, এ আঘাতেব প্রয়োজন ছিল।' সন্তর্পণে কনকলতাকে খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে ডেকে বললেন 'ক্ষ্যামা, শিগ্‌গির জল নিয়ে এসো, গিন্নিমা মূর্চ্ছা গিয়েছেন।'

বহুদিন সযত্নে লালন করা যে আশাতরু তার গভীর মূলদেশে সহস্র বাহু বিস্তার করে কনকলতার হৃদয়কে সহস্র পাকে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছিল সে বাঁধন যখন প্রচণ্ড

আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তখন নিজেকে খাড়া রাখবার মত শক্তি কনকলতার হারিয়ে গেল। সে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও রাজীবলোচন তাঁকে দুঃখ দিতে বাধ্য হলেন, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি কপালের ঘাম মুছে ফেললেন।

কনকলতা আস্তে আস্তে চোখ খুললেন, চোখ মেলেই চারদিকে চেয়ে তিনি যাকে খুঁজতে লাগলেন সে ম্লান মুখে বিছানার পাশে এসে বসলো, সস্নেহে লীলার গায়ে হাত বুলিয়ে কনকলতা বললেন, 'ভয় নেই লীলা, আমি ভাল হয়ে গেছি।'

গৃহচিকিৎসক এসে ওষুধ পত্র দিলেন, বললেন, 'মাকে খুব সাবধানে রাখবেন, হার্টটা দুর্ব্বল হয়েছে। ভয় কিছু নেই তবে এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে।'

রঞ্জন দূর থেকে মাকে দেখে, কাছে আসতে সাহস পায় না পাছে মার অসুখ বাড়ে। দরজার কাছে তাকে দেখে কনকলতা ক্ষীণস্বরে ডাকেন, 'রঞ্জু, আমার কাছে আয়।' রঞ্জন পায়ে পায়ে মায়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়ায়। কনকলতা বলেন 'আমার পাশে বোস্, তুই অত দূরে দূরে থাকিস্ কেন, তুই কাছে এলেই আমি ভাল হয়ে যাব।' মা ছেলের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নেন, রঞ্জন আলগোছে মাথাটা মার বুকের উপরে রাখে। তার বিশৃঙ্খল চুলগুলো কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে মা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন,

'লীলা কোথায় রে রঞ্জু ?' রঞ্জন বলে, 'দেখিনি তো মা, ডেকে দেব ?' মা ক্লান্তস্বরে বলেন, 'না, থাক।'

কিছুদিন পরে ভাল হয়ে উঠে কনকলতা আবার স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম্ম করতে লাগলেন কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অহোরহ লেগেই থাকতো। বাইরে থেকে তা' দেখা না গেলেও ভিতরটাকে ক্ষয় করতে লাগলো।

মাঝে মাঝেই লীলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতেন 'লীলা, তোকে যদি খুব বড়লোকের ঘরে বিয়ে দি, তোকে সবাই খুব আদর করে তা' হলে বেশ হয়, না ?'

লীলা কনকলতার বুকে মুখ গুঁজে বলে, 'আমাকে বিয়ে দিওনা মা-মণি, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।'

উদ্গত চোখের জল চোখে চেপে কনকলতা বলেন, 'দূর পাগলী, বিয়ে হলে দেখবি শ্বশুর শ্বাশুড়ী সবাই আদর করবেন তখন কেমন ভাল লাগবে।'

লীলা আকুল হয়ে বলে, 'না, না, না, আমি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর আদর চাইনে, আমায় বিয়ে দিওনা মা-মণি আমি তা হলে মরে যাব।'

কনকলতা পিঠে হাতবুলিয়ে বলেন, 'ষাটৃ, ষাটৃ, ও কথা বলতে নেই, যা তুই এখন তোর হরিদার কাছে গল্প শোনগে যা।'

গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে রঞ্জন কলকাতায় কলেজে পড়তে চলে গেল। বিরাট বাড়ীর ঘর দুয়ার যেন লীলার

কাছে শূন্যময় হয়ে গেল। সে অন্যমনস্ক হয়ে দরজা ধরে বাহিরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কত যেন সে শান্ত হয়ে গেছে। আমবাগানে ভুলেও একবার যায় না। কনকলতা সব বুঝতে পারেন কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলেন না। আড়াল থেকে দেখেন দিনের মধ্যে কতবার যে লীলা রঞ্জনের শোবার ঘরে ঢোকে, এটা ঝাড়ে ওটা মোছে। নিষ্প্রয়োজনে বিছানা পাতে, যেন সব আগেকার মতই স্বাভাবিক আছে, যেন কোন এক সময়ে বাইরে থেকে এসে রঞ্জন গড়িয়ে পড়বে বিছানায় নয়তো টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে বই পত্র খুলে বসবে, লীলাকে বলবে, 'লীলা, এক গেলাশ জল দেতো।'

আগে যদিও দু একবার বাইরে কোথায়ও বেড়াতে গিয়েছে এই প্রথম রঞ্জন গ্রাম ছেড়ে সহরে বাস করতে এলো। হোষ্টেলে থাকতে তারও ভালো লাগেনা, কেবলি মার কথা মনে পড়ে, এলোমেলো বিছানা আর বই পত্র ছড়ানো টেবিল দেখে লীলার হাতের যত্নের কথা মনে হয়। সে দিনও লীলা ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, অতর্কিতে চেয়ারের পেছনে এসে তার চুল টেনে পালিয়ে গেছে, আমবাগানে নুন আর কাঁচালঙ্কা নিয়ে লুকিয়ে বসে তার প্রতীক্ষা করেছে, পুকুরের জল তোলপাড় করে দুজনে সাঁতার কেটেছে এ সবই কি অতীতের স্মৃতি হয়ে রইলো? পড়াশোনায় মন বসে না ষোল সতের বছরের কিশোর কেবল বাড়ীর ভাবনা

ভাবে। কলেজের সহপাঠীরা আলাপ করতে চায় তার সঙ্গে কিন্তু সে কারু সঙ্গে মিশতে পারে না, ছেলেরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে নিরুত্তর হয়ে থাকে। মহানগরীর বৈচিত্র্য ময় রূপ তার মন ভরতে পারে না, প্রশস্ত পথ ঘাট, বড় বড় অট্টালিকা, বিচিত্র চেহারার যান-বাহন সব যেন চোখের উপরে কেবল ভাসা ভাসা ছায়া ফেলে, মনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। সেই ছায়াঘন আম বাগান, মেঠো পথ, সবুজ ঘাসে ছাওয়া খেলার মাঠ, রৌদ্রে উজ্জ্বল পুকুরের জল সব যেন অহোরহ তার মনকে টানতে থাকে। সে ভাবে কেমন করে এই ইঁটের কারাগারে সে দিন যাপন করবে, দীর্ঘদিন কতবছর তাকে পড়াশোনা করতে হবে, কেমন করে সে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় পাস করবে? মাকে প্রায়ই চিঠি লেখে, যদিও সে কিছু প্রকাশ করেনা তবু তার মধ্যে গোপন থাকেনা তার এই মনের ব্যাকুলতা, মায়ের প্রাণের তারে তার মনের সুরের অনুরণন বাজতে থাকে। রঞ্জন দিন গোনে পূজোর ছুটি কবে আসবে, কবে সে ফিরে যাবে তার চিরপরিচিত ঘরে, অচেনার পরিবেশে মন তার হাঁপিয়ে উঠতে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা কনকলতা কাজে ব্যস্ত ছিলেন লীলা ছুটে এসে বললো 'মা-মণি, একটা ফরসা চাদর বার করে দাও তো।' কনকলতা হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, 'কি হবেরে চাদর দিয়ে?'

লীলা অনুযোগ করে বললো, 'বাঃ তুমিতো সব কথাই ভুলে যাও, কাল ভোরে রঞ্জুদা আসছেনা ? তার ঘর গুছিয়ে না রাখলে আমার কি রক্ষে আছে ?'

কনকলতা হেসে ফেল্লেন, বললেন, 'তাইতো, ভাগ্‌গিস আমাকে মনে করিয়ে দিলি, আমিতো একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

রঞ্জন কলকাতা থেকে এসে পৌঁছাল, পাখীরা তখন কেবলই কাকলি স্বুরু করেছে। এবার আশ্বিনের শেষের দিকে পূজো। একটু একটু শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে, শরতের রৌদ্রতপ্ত দিনের প্রান্তে একটু খানি শিশিরের ভিজে ভিজে আভাস পাওয়া যায়, ভোর বেলাতেও তার স্নিগ্ধতা একটু লেগে থাকে।

কাছারী বাড়ী থেকে বাবাকে প্রণাম করে রঞ্জন বাড়ীর ভিতরে এল, হাসিমুখে কনকলতা কাছে এসে দাঁড়ালেন, রঞ্জন তাঁকে প্রণাম করবার চেষ্টা করতেই মা হেসে দু হাতের মধ্যে তাকে বেঁধে ফেললেন। রঞ্জন বললো, 'ছাড় মা তোমায় প্রণাম করি।' মা বললেন 'থাক তোর আর প্রণাম করতে হবে না, আয় তোর সব কথা শুনি।'

লীলা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, রঞ্জনের তাকে দেখে কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগলো। সে বড় হয়েছে এখন কলেজে পড়ে আর তো ওর সঙ্গে মারামারি করা চলবেনা, এখন ভদ্র হতে হবে। লীলার দিকে চেয়ে রঞ্জন আস্তে আস্তে বললো, 'লীলা, ভালো আছ ?' লীলাকে তুই বলতে আজ যেন তার

মুখে বেধে গেল, এত দিন অবাধে লীলার উপর যে জুলুম করে এসেছে তা' যেন একটা ছেলে মানুষী ছিল এখন সে বড় হয়ে গেছে।

লীলার কান্না পাচ্ছিল। সেই রঞ্জুদা এত অল্পদিনে কেমন করে এমন বদ্‌লে গেল! সে কল্পনা করে রেখেছিল রঞ্জন এসেই তার চুল ধরে টেনে দেবে কিন্তু সেই রঞ্জুদা কেমন করে এমন শান্ত হয়ে গেল লীলা ভেবে পায় না। রঞ্জনের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে চলে গেল। রঞ্জন বললো, 'মা, লীলা কি আমার ওপর রাগ করেছে?' মা বললেন, 'রাগ করবে কেন? তুই যা, হাত মুখ ধুয়ে আয়, খাবার খাবি। ও লীলা, তোর রঞ্জুদার খাবারটা সাজিয়ে নিয়ে আয়তো মা।'

ক্ষেমঙ্করী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, বললো, 'দাদাবাবু কেমন আছগো? কেমন লাগলো কলকাতা সহর, সেখানে নাকি চিঁড়েখানায় অনেক জন্তু জানোয়ার থাকে আর রাস্তায় নাকি সব কলের গাড়ী চলে?'

রঞ্জন চোখতুলে তার দিকে চেয়ে বললো 'হ্যাঁ ক্ষ্যামাদি।'

ক্ষ্যামা কার্পেটের আসনখানা বারান্দায় বিছিয়ে দিয়ে বললো, 'বসো, এখন জলটল খাও তারপর তোমার কাছে কলকাতার গল্প শুনবো।'

মার কাছে বসে খাবার খেতে খেতে প্রবাস দিনের সব দুঃখের কথা মার কাছে উজাড় করে দিয়ে রঞ্জনের মনটা হাল্‌কা

হয়ে গেল। এবার সে লীলার খোঁজে এঘর ওঘর দেখে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। লীলা রঞ্জনের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে এক খানা গরম কাপড় ভাঁজ করে খাটের পায়ের দিকে রাখছিল, রঞ্জনের উপস্থিতি বুঝতে পেরেও সে ফিরে চাইলো না এতে রঞ্জন ভয়ানক আশ্চর্য্য হল। একবার অদম্য ইচ্ছে হল ওর মস্ত বড় চুলের বিনুনীটা ধরে টেনে দেয় কিন্তু নিজেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে ভাবলো, ছি, সে এখন কলেজে পড়ে, লোকে দেখলে হাসবে না ? রঞ্জনের মনে হল এই তিন মাসেই লীলা যেন একটু লম্বা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে রঞ্জন ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, হাত বাড়িয়ে ওর আঁচল ধরে টানতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিল, ভয়ে ভয়ে বললো, 'লীলা তুমি আমার ওপর রাগ করেছ কেন ?' তবু লীলা কথা বলেনা। পেছন থেকে লীলার মুখের চেহারাটা রঞ্জন দেখতে পাচ্ছিল না, খাটের পাশ দিয়ে ঘুরে ওদিকে গিয়ে রঞ্জন লীলার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। লীলা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল বোধহয় চোখের জল গোপন করছিল, অবাক বিস্ময়ে রঞ্জন দেখলো নতমুখী লীলার চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরে পড়ছে। হতবুদ্ধি হয়ে রঞ্জন বললো, 'লীলা আমি কি কোন দোষ করেছি ?' রঞ্জন বলতে পারলো না যে, লীলা, এতদিন তোমার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছি, শুধু সেকথা তার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করে ফিরতে লাগলো। লীলা ভাব্‌লো, সেই রঞ্জুদা ! যে অবাধ অধিকারে লীলাকে নির্ব্বিচারে যা' খুসী বলেছে যা' কিছু করেছে, অকারণে

বিনাদোষে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে, সেই রঞ্জুদা! আজ লীলার কোন্ অপরাধে তার সেই শাস্তি নতুন রূপ নিয়ে এলো? লীলা কেঁদে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। রঞ্জনের হঠাৎ মনে হল, শুধু সেই নয় লীলাও বুঝি এই তিন মাসে বড় হয়ে গেছে না হলে সে বড় মেয়েদের মত এত গম্ভীর হল কেমন করে?

কয়েক দিনের মধ্যেই লীলার মনের মেঘ কেটে গিয়েছে, আবার দুজনে অজস্র কথায় দিন রাত্রিকে মুখর করেছে কিন্তু লীলাকে প্রথম দিন যে সঙ্কোচের বশীভূত হয়ে তুই বলতে বেধেছিল সে সঙ্কোচ রঞ্জন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তুই তুমিতে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু তাতে অবাধ আলাপনের কোন বাধা হয়নি। কলকাতার অনেক গল্প,—যে সহর রঞ্জনের মনকে কাছে থেকে মোটেই আকর্ষণ করতে পারেনি, ছায়াময় হয়েই ছিল, দূরে এসে রঞ্জন যেন তার অবয়ব স্পষ্ট দেখতে পেল আর তার বর্ণনা করে লীলাকে অবাক করে দিল।

পূজোর ছুটির স্বল্প অবসর দেখতে দেখতে কেটে গেল। আসন্ন পুনর্বিচ্ছেদের ছায়া দিনান্তের ম্লানায়মান গোধূলির মত বিষণ্ণ করেছে দুটি হৃদয়কে, তবু যেতে হয়।

মা নারকোলের নাড়ু, ক্ষীরের তক্তি, খাঁটি ঘি সঙ্গে দিয়ে দিলেন, এসব জিনিস রঞ্জু কলকাতায় পায় না। একদিন সন্ধ্যায় বাবা মায়ের পায়ে প্রণাম করে রঞ্জন কলকাতায় রওনা হয়ে গেল; সেখানে গিয়ে সেই নিস্পৃহার অবসাদ আবার তার মনকে ঘিরে ধরতে থাকে।

রঞ্জনের সতীর্থ সনৎ ওর সঙ্গে এক ঘরেই শোয়। প্রথম যখন রঞ্জন এখানে এল তখন ওর সঙ্গে আলাপ করবার সে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু রঞ্জনের দুর্ভেদ্য মৌন ব্রতকে সে কিছুতেই জয় করতে পারেনি। এবার বাড়ী থেকে ফিরে এলে সনৎ আর একবার চেষ্টা করবে মনস্থ করেছিল।

গভীর রাত্রে অন্ধকার ঘরে জেগে উঠে সনৎ অনুভব করলো রঞ্জন কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না, ছট্‌ফট্‌ করছে। ভাবলো, সদ্য দেশ থেকে ফিরে বোধহয় মার জন্যে ওর মন কেমন করছে। লাফ দিয়ে নিজের বিছানা ছেড়ে সে রঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'রঞ্জন, ঘুমোচ্ছনা কেন? আলোটা জ্বেলে দেব?'

তার কণ্ঠে সহানুভূতির সুর শুনে রঞ্জনের চোখের কোল আর্দ্র হয়ে ওঠে, আস্তে আস্তে উত্তর দেয় 'না, দরকার নেই।'

পরদিন রবিবার। সকাল বেলা সনৎ রবীন্দ্রনাথের একখানা 'সঞ্চয়িতা' এনে রঞ্জনকে পড়তে দিল। বললো, 'রবি ঠাকুরের কোন লেখা এর আগে পড়েছো?'

রঞ্জন জানালো যে তার পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সে রবীন্দ্র নাথকে জানে। সনৎ রঞ্জনের চেয়ে বছর দুইয়ের বড় হবে, বহির্জগতের সম্বন্ধে সে রঞ্জনের চেয়ে অনেক বেশী খবর রাখে। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, খেলাধুলা সব কিছুতেই সনতের অনুরাগ। রঞ্জনকে প্রশ্ন করলো 'রবীন্দ্র নাথ বিদেশে আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, নোব্‌ল প্রাইজ পেয়েছিলেন উনি, শুনেছো?' রঞ্জন ঘাড় হেলিয়ে বললো, সে জানে। সন্তুষ্ট

হয়ে সনৎ বললো, 'আচ্ছা, তুমি এখানা পড়ো, ভাব যদি না বুঝতে পারো আমায় বলো আমি বুঝিয়ে দেব।' রঞ্জন বললো, 'আচ্ছা।'

রঞ্জন 'সঞ্চয়িতা' পড়তে লাগলো। প্রথমে অবোধ্য মনে হয় তারপর দিনে দিনে যত পড়ে তত ভালো লাগে। অবাক বিস্ময়ে সে আবিষ্কার করে তারই অন্তরের ব্যথা বেদনা, আনন্দ অনুভূতি সব যেন রূপ নিয়েছে ওই লেখার মধ্যে, সে চমৎকৃত হয়। সনতের সহায়তায় দিনে দিনে রবীন্দ্র নাথের কাব্যের সঙ্গে সে পরিচিত হতে থাকে, অজানার আস্বাদ পেয়ে তন্ময় হয়ে ডুবে যায় সে। তার মনে হয় যেন কোন গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধান সে পেয়েছে যার মধ্যে জীবনের সব গোপন রহস্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে আনন্দ আর বেদনা এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে রয়েছে। তার মূক বেদনা রবীন্দ্র কাব্যে ভাষা পায়। সনৎ মাঝে মাঝে ওকে পড়ে শোনায়, তার উদার গম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তির সঙ্গে ভাবের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা রঞ্জনকে উন্মন করে, বিমুগ্ধ করে। রঞ্জন দিনে দিনে সনতের ভক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন সনৎ বলে 'রঞ্জন, চল সিনেমা দেখে আসি।' রঞ্জন বলে 'না সনৎদা, আমার ভালো লাগে না।'

সনৎ জোর দিয়ে বলে 'নিশ্চয় ভালো লাগবে, তুমি ওর রস পাওনি, তাই। শেষে দেখবে সব সময় সিনেমা দেখার একটা ইচ্ছে জেগে থাকবে। তোমাদের দেশে সিনেমা কখনও দেখেছো ?'

রঞ্জন বললো 'আমাদের মহকুমাতে সিনেমা হল্ আছে, দু একবার সেখানে দেখেছি আমার বেশী ভালো লাগেনি।'

সনৎ বলে, 'আচ্ছা আমার সঙ্গে যাবে কেমন করে ভালো লাগাতে হয় তা আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব। আজই চলনা। দেখবে সিনেমা নীরসকে রসে সঞ্জীবিত করে, দুঃখকে সান্ত্বনা দেয়। যাবে?'

রঞ্জন বলে 'না ভাই, তা হলে পড়াশোনা হবে না, কালকে ক্লাসে লেক্চার ফলো করতে পারব না। তারপর ডক্টর মজুমদারের কাছে—' বাধা দিয়ে সনৎ বললো, 'দুত্তোর পড়াশোনা। পরীক্ষায় পাস করাটাই কি জীবনের একমাত্র সার্থকতা নাকি? জীবনের অনেক দিক আছে, অনেক কিছু পাবার আছে রঞ্জন, জীবনটাকে উপভোগ করতে হয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—বীরেরাই জীবনকে জয় করে, ভীরুরা নয়। তুমি সবতাতেই ভয় পাও কেন? যৌবন দুর্দ্দান্ত, সে কারুকে ভয় করে না, কোথায়ও পরাজয় স্বীকার করে না, কোথায়ও নত হয় না। যৌবনকে উপভোগ করতে না পারলে জন্মই বৃথা হয়ে যায় রঞ্জন!'

রঞ্জনের সব যেন এলোমেলো মনে হয়, জীবনের ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলা যেন হারিয়ে যায়। সনৎ একটা সিগারেট নিয়ে রঞ্জনের হাতে গুঁজে দিতে যায় রঞ্জন হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দেয়। সনৎ নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে টানতে থাকে, রঞ্জন শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

মন তার কোথায় পলাতক হয়, সেই পলাশপুরের মাঠে ঘাটে বাগানে, মায়ের স্নেহঘেরা আঁচলের তলে, লীলার লীলাভরা চঞ্চলতার অন্তরালে ভয়ব্যাকুল মন তার আশ্রয় খোঁজে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রঞ্জনের কাছে সনৎ রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' আবৃত্তি করছিল, তার পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট উচ্চারণ, তার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য যেন সঙ্গীতময় হয়ে রঞ্জনকে অভিভূত করেছিল। উচ্চগ্রাম থেকে মন্দীভূত হয়ে সনতের কণ্ঠস্বর যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল রঞ্জন মুগ্ধনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলো, তার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকলো,

'এনেছি শুধু বীণা,—
দেখতো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না?'

সনৎ বললো, 'রঞ্জন, নারী বিচিত্রা, নারী অপূর্ব্বা, নারী জীবনের মূলমন্ত্র বিধায়িনী। কল্পনা করতে পারো রঞ্জন একটি মাত্র মেয়ের জন্যে অত বড় ট্রয় নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, একটি মাত্র মেয়ের জন্যে মেবারের গগনস্পর্শী রাজগৌরব শোণিতের স্রোতে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, একটি মাত্র মেয়ের জন্যে প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়েছিল। তাই বল্‌ছি নারী বিচিত্রা, জীবনের মূলমন্ত্র বিধায়িনী।

জীবনকে চিনতে শেখো, যৌবনকে মর্য্যাদা দাও, জীবনের সম্বন্ধে তুমি বড় অজ্ঞ রঞ্জন।'

রঞ্জন যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিল। সনতের কণ্ঠ থেমে গেলেও তার মনের মধ্যে তার অনুরণন বাজছিল।

কল্পনার চোখে সে দেখতে পাচ্ছিল রূপৈশ্বর্য্যময়ী, লোকললামভূতা, স্পার্টান রাজলক্ষ্মী হেলেন বিশ্বমানসের শাশ্বত সৌন্দর্য্যলোকে অম্লান প্রদীপ্তরূপে দাঁড়িয়ে আছে, অপরূপা রাজপুতসুন্দরী পদ্মিনী জহর ব্রতের অনুষ্ঠানে অবলীলায় লেলিহান অগ্নিশিখায় তার অপরূপ সৌন্দর্য্যকে আহুতি দান করছে; অপরূপ মহিমাময়ী সীতা অশোক বনের কারান্তরালে প্রিয় চিন্তায় বিভোর, তরুচ্যুত অশোক কুসুম ঝরে পড়ছে স্খলিতগুণ্ঠনার কেশে, সর্ব্ব অঙ্গে, যেন দেবীর উদ্দেশে পূজাপুষ্প উৎসর্গিত হচ্ছে। বিমোহিত রঞ্জন বিহ্বল হয়ে বসে থাকে।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে রঞ্জন অনুভব করতে পারেনি। সনৎ তাকে ঠেলা দিয়ে বলে 'রঞ্জন, খাবার ঘণ্টা পড়েছে, চল খেতে যাই।'

রঞ্জন কলকাতায় চলে গেলে কতবার যে লীলা তার ঘর গোছায়, সব ঝাড় পোঁছ করে তার সীমা নেই তবু তার সময় কাটে না। প্রত্যক্ষ সেবার সুযোগ যখন রইলো না তখন সে নারায়ণীর কাছে গিয়ে বললো, 'মা, আমায় উল বুনতে শিখিয়ে দাও, আমি রঞ্জুদার জন্যে সোয়েটার বুনবো।' মা সাশ্চর্য্যে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, সেই চঞ্চল, দুরন্ত মেয়ে কেমন করে এমন শান্ত হয়ে গেল!

সোয়েটার বোনা হয়ে গেলে সে কনকলতার কাছে নিয়ে

গিয়ে বললো, 'মা-মণি, আমি রঞ্জুদার জন্যে এটা বুনেছি।' কনকলতা বুঝতে পারছিলেন রঞ্জনের জন্যে কোন একটা কিছু না করে সে আর থাকতে পারছে না, তাই বুভুক্ষিত মন তার পরোক্ষ সেবার উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। এই স্থূল জিনিসের সঙ্গে তার কত দিনের কত মুহূর্ত্তের প্রিয় চিন্তা জড়িয়ে গেছে তা' কনকলতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিলেন। নিরুপায়ের বেদনা রাত্রিদিন কনকলতার অন্তরকে মথিত করে, এই তরুণ উন্মুখ আশাতুর মনকে কেমন করে ফেরান যায়, কেমন করে ওকে বোঝান যায় যে, ওরে তুই এতদিন যা' কামনা করে এসেছিস্ তা তোর পাবার নয়।

সোয়েটারটা হাতে নিয়ে কনকলতা বললেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে, ছোট বোনের হাতের তৈরী জিনিস পেয়ে রঞ্জু খুব খুসী হবে, নে, বাক্সে তুলে রাখ্।'

আকস্মিক ভাবে বেত্রাহতের মত লীলার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে গেল, হাত থেকে তার অজ্ঞাতেই বুঝি সোয়েটারটা মাটিতে পড়ে গেল। বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে মুখ তুলতেই কনকলতা আর তার দিকে চাইতে পারলেন না। যে আঘাত লীলাকে তিনি দিলেন সে আঘাতে তাঁরও হৃদয় বেদনার্ত্ত হয়ে উঠেছিল, চম্‌কে উঠে লীলাকে তিনি নিঃশব্দে কাছে টেনে নিয়ে মাথাটা তাঁর বুকের ওপর চেপে ধরলেন, সহস্র চেষ্টায়ও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না, ধারায় ধারায় অজস্র চোখের জল ঝরে পড়ে লীলাকে অভিষিক্ত করতে লাগলো।

আই. এ. পরীক্ষার পরে রঞ্জন বাড়ীতে এলো, দেখলো এবার লীলা সত্যিই বড় হয়ে গেছে। মাথায় সে অনেকটা লম্বা হয়েছে, পল্লবিনী লতার মত তার সর্ব্বাঙ্গে এমন একটা লাবণ্যের আবির্ভাব হয়েছে যা' চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। এক সময় রঞ্জন লীলাকে বলে, 'লীলা তুমি দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছো।'

লীলা সলজ্জভাবে বলে 'আঃ রঞ্জুদা, তুমি এবার কলকাতা থেকে খুব কথা শিখে এসেছো দেখছি।'

রঞ্জন বললো, 'বাঃ, সত্যি কথা বুঝি বলতে নেই?'

লীলা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। সদ্যঃস্নাতা লীলার সজল কেশভার পিঠ ছেয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল, তার দিকে চেয়ে রঞ্জনের মনে পড়ে গেল,—

'সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।'

আঠার বছরের রঞ্জন, পনের বছরের লীলা।

পরীক্ষার ফল বেরুলো, রঞ্জন ভাল করেই আই. এ. পাস করেছে। রাজীবলোচন তার সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হলেন, কনকলতাকে ডেকে হাসিমুখে বললেন, 'নাও, তোমার রঞ্জু তো এবার মানুষ হবার পথে, আমার বড় ভয় ছিল ও পরীক্ষায় পাস করতে পারবে কিনা। পড়াশোনার মর্য্যাদা ও বুঝতে পেরেছে।'

কনকলতা মুখে হাসির আভাস টেনে আনেন, মুখে কিছু বলেন না।

কনকলতা দিনের অনেকটা সময়ই রান্না ঘরে কাটান, এটা ওটা রান্না করেন, নানা রকমের খাবার তৈরী করেন। হরিহরের ভয়ানক উৎসাহ, কনকলতার হাতের কাছে সব উপকরণ যোগায়; দাদাবাবু কি খেতে ভালবাসে সব হরিহরের মুখস্থ, কি করবে ভেবে পায় না।

রঞ্জন এসে বলে, 'মা, ও মা, তুমি কি সারাদিন রান্না ঘরেই থাকবে? এসো না তুমি হরিদাই রান্না করুক।'

মা বলেন, 'দাঁড়া বাবা, মশলাটা আন্দাজ করে দিয়ে আসি, মাছের কালিয়াটা হলেই আমি বেরিয়ে আসব।'

দরজার কাছে এসে বলেন, 'কলকাতার হোস্টেলের ঠাকুর কি রকম রান্না করে রে, খেতে পারিস্ তো?'

রঞ্জন বলে, 'ওখানে ওসব আমার খেয়াল থাকে না মা, পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কলেজের তাড়াহুড়ো, যা রান্না করে দেয় তাই খেয়ে নি।' মা করুণ স্নেহে তার মুখের দিকে তাকান। ছেলে মায়ের কাছে এসে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, বলে, 'মা, এই দেখ আমি তোমার চেয়ে কত বড় হয়ে গেছি।' মা হাসিমুখে তাকে দুহাতের বেষ্টনে কাছে টেনে নেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নারায়ণী তুলসী তলায় দীপ দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছেন রঞ্জন এসে আঙ্গিনায় দাঁড়ালো। বললো, 'মাসিমা, তোমায় কাল একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।'

মাসিমা বললেন, 'আয় রঞ্জু, ঘরে বোস্, কি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিস্ রে ?'

রঞ্জন বললো, 'আমি এবার স্কলারশিপ পেয়ে গেছি তা' মায় বলা হয়নি।'

নারায়ণী হাসিমুখে বললেন, 'তা তো পাবিই, তুই যে আমার পরশ পাথর, যা' ছুঁবি তাই সোণা হয়ে যাবে।'

রঞ্জন হেসে ফেললো। বললো, 'মাসিমা, তোমার পরশ পাথরকে তা হলে এগ্‌জামিনাররা চিনতে পেরেছে।

দেখো মাসিমা, আমি ক'দিন থেকে একটা কথা ভাবছি। কলকাতায় লীলার মত মেয়েরা দলে দলে ইস্কুলে যায়, আমার ইচ্ছে ও-ও কিছু পড়াশোনা করে। আমি এবার কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো বই ওকে পাঠিয়ে দেব।'

নারায়ণী বললেন 'তোর ইচ্ছে হলে ও নিশ্চয়ই পড়বে, তোর ইচ্ছের চেয়ে বড় তো ওর কাছে আর কিছুই নেই।'

রঞ্জন অনেকদিন হল কলকাতায় চলে গিয়েছে। বি. এ. তে অঙ্কে অনার্স নিয়েছে, পড়াশোনা বেশী করতে হবে।

কলকাতা থেকে একদিন কনকলতার নামে একটা বইয়ের প্যাকেট এল। কনকলতা খুলে দেখেন, প্রত্যেক বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় রঞ্জনের হাতের লেখা, 'লীলার জন্যে'।

লীলাকে ডেকে বইগুলো তার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর রঞ্জুদা তোর জন্যে এগুলো পাঠিয়েছে।' বইগুলো হাতে নিয়ে

লীলার মুখ চোখ এক সলজ্জ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, দুইহাতে সাগ্রহে সে বইগুলো বুকের ওপর চেপে ধরলো। কনকলতার মুখ দিয়ে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন হাহাকারের মতই বেরিয়ে এল।

রাজীবলোচন মাঝে মাঝে বলেন, 'লতা, তুমি যেন বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ, কি কষ্ট তোমার শরীরে হয় তা' খুলে বল, না হলে অসুখ সারবে কি করে?'

কনকলতা স্মিতমুখে বলেন, 'কই আমার তো কোন অসুখ নেই, তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হোয়ো না।'

কিন্তু সত্যি করেই কনকলতার লাবণ্যময় মুখখানি ক্রমে শীর্ণ হয়ে আসছিল, মাঝে মাঝে বুকের ভেতর কি একরকম অব্যক্ত যন্ত্রণা হয়, মূর্চ্ছিতের মত পড়ে থাকেন। কিন্তু কনকলতা তাকে স্বীকার করতে চান না, কারু কাছে প্রকাশ করেন না, ওইটুকুর জন্যে রাজীবলোচনকে ব্যস্ত করা চলে না। তাই মুখে হাসি টেনে এনে বলেন 'আমি তো ভালই আছি।' কিন্তু তাঁর বিশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে রাজীবলোচনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সেদিন পূজারী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতা জনার্দ্দনের নিত্য পূজা ভোগ ইত্যাদি সমাপন করে বেরিয়ে গেলে কনকলতা নিজের আসনখানি টেনে নিয়ে ঠাকুরের সামনে জপে বসলেন। অনেকক্ষণ নিমীলিত নয়নে যুক্তকরে বসে রইলেন, চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরে পড়তে লাগলো। একসময়ে মাথা নত করে দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,

'ঠাকুর, আমার সুখ দুঃখ সব তুমি নাও, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা সব তুমি নাও, আমাকে মুক্তি দাও ঠাকুর, আর যে আমি পারিনে। দয়া করে আমাকেও নাও, আমাকেও তুমি নাও ঠাকুর!' এই আত্মনিবেদনের মধ্যে নিজের সমস্ত সত্তা ঢেলে দিয়ে কনকলতা ঠাকুরের পায়ের কাছে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন, বুকের ভেতরকার সেই অব্যক্ত দারুণ যন্ত্রণা তাঁর সমস্ত শরীরকে তাঁর মস্তিষ্ককে যেন অসাড় করে দিচ্ছিল।

অনেকক্ষণ কনকলতাকে ঠাকুর ঘর থেকে বেরুতে না দেখে লীলা এসে ঘরে ঢুকলো, বললো, 'ও মা-মণি, তোমার পূজো কি আজ শেষ হবে না?'

কনকলতার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে লীলা ভয় পেল, মা-মণি বোধ হয় আবার মূর্চ্ছা গিয়েছেন যেমন মাঝে মাঝে হয়। সে ব্যাকুলভাবে বাইরে এসে ক্ষ্যামাকে ডেকে বললো, 'ও ক্ষ্যামা দি, শিগ্‌গির এসো, মা-মণি কথা বলছেন না।'

ক্ষ্যামা দৌড়ে এল, কাছারী বাড়ী থেকে রাজীবলোচন এলেন, বাড়ীর যে যেখানে ছিল সবাই ঘিরে ধরলো, শুশ্রূষা যতটা হবার হলো কিন্তু কনকলতা আর চোখ মেললেন না। ডাক্তার এসে বললেন, 'আর কিছু নেই। এ্যাপোপ্লেক্সি, প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়ে গেছে।'

লক্ষ্মীহীন সংসারে আর শ্রী নেই। রাজীবলোচন দিনের বেশীর ভাগ সময়ই বাহিরে কাটান, শোবার সময়ে রাত্রে যখন নিজের ঘরে আসেন শূণ্য শয্যা তাঁর বুকে যেন হাতুড়ী পিটতে

থাকে। মনে মনে বলেন, লতা, যদি পার আমায় ক্ষমা কোরো, আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো।

লীলা জমিদার বাড়ী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নারায়ণীর ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আর তার চাপল্য নেই, নেই কথার অজস্রতা, একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেছে সে। হরিহর মাঝে মাঝে তাকে দেখতে আসে।

রঞ্জন এসেছিল, কয়েকদিন পরেই কলকাতায় ফিরে গেছে। তার উদ্‌ভ্রান্ত শোকাতুর মূর্ত্তি লীলার বুকের মধ্যে যেন শোণিতের অক্ষরে আঁকা হয়ে গেছে। যাবার সময় রঞ্জন লীলাকে একটি কথাও বলতে পারেনি, অশ্রুমুখী লীলার দিকে একবার মাত্র চেয়ে নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল। কোথায়ও আলোর রেখা নেই, গাঢ় অন্ধকারে লীলার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে।

কলকাতায় এসে রঞ্জন পড়াশোনার ভেতরে ডুবে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলো, মার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল রঞ্জন ভালো করে বি. এ. পাস করবে। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না, মায়ের স্নেহকোমল চোখের দৃষ্টি অনুক্ষণ তার চোখে চোখে ভাসে।

দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে টেবিলের সামনে বসেছিল, সনৎ এসে বলে, 'ওঠ রঞ্জন, ভুলে থাকবার চেষ্টা কর, মা কি কারু চিরদিন থাকে ?' রঞ্জন তবু মুখ তোলে না। সনৎ তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় বসায়, আস্তে আস্তে তার পিঠের ওপর হাত রাখে। বলে, 'দেখো রঞ্জন, মানুষ

প্রয়োজনের দাস, তার মধ্যে জৈব প্রয়োজনের দাবী সকলের আগে। তুমি যখন শিশু ছিলে অসহায় ছিলে, তখন খাওয়া ঘুম আরামের জন্যে মাকে তোমার প্রয়োজন ছিল, এখন তুমি বড় হয়েছো, আত্মনির্ভরশীল হয়েছো এখন তো আর মাকে তোমার প্রয়োজন নেই।'

এ রকম অদ্ভুত কথা রঞ্জন জীবনে শোনে নাই, সিক্ত চোখে সে সনতের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সনৎ আবার বলে, 'এখন তোমার মনোজগতের দাবীকে স্থান দিতে হবে। বাহিরের স্থূল প্রয়োজন মিটলে মন তখন মানুষের কাছে তার ক্ষুধার আবেদন জানায়। তার খাদ্য হচ্ছে সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা, সর্ব্বোপরি তার দেহ মন দুইয়েরই জন্যে প্রয়োজন প্রিয়ার।'

রঞ্জন সাশ্চর্য্যে সনতের মুখের দিকে চেয়ে রইলো, ভাবতে লাগলো, এত সব সনৎ জানলো কি করে? কিন্তু মানুষের জীবনে কি নতুন করে প্রিয়ার আবির্ভাব ঘটে? আশৈশব লীলাকে যে কত ভালবেসে এসেছে আগে কখনও তা সে উপলব্ধি করতে পারেনি, দূরে এসে বুঝতে পেরেছে লীলা তার জীবনের কতখানি জুড়ে আছে। এক সময়ে সে ছিল খেলার সাথী, আজ সে তার বেদনার সাথী, জীবনের সাথী লীলা,—লীলাকে বাদ দিলে আর তার জীবনে কোন আনন্দই অবশিষ্ট থাকে না। লীলাই তার পরম প্রিয়া, আর কারু আবাহনের সেখানে স্থান নেই।

একদিন কলেজ ছুটির পরে কলেজের করিডরে একটি মেয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে সনৎ এসে সেখানে দাঁড়ালো। বললো, 'এসো রঞ্জন, চিত্রা দেবীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি। ইনি চিত্রা মজুমদার, হিষ্ট্রীতে অনার্স নিয়েছেন, প্রেসিডেন্সীতেই পড়েন। আর চিত্রা, ইনি রঞ্জন চৌধুরী, তোমার বাবার ছাত্র।'

মেয়েটি দুহাত বুকের কাছে যোড় করে রঞ্জনকে নমস্কার জানালো, রঞ্জনও প্রতিনমস্কার করলো। তার মনে হল যদিও সে কোনদিন ভাল করে লক্ষ করে দেখেনি তবু মনে হয় মেয়েটিকে মাঝে মাঝেই তার চোখে পড়েছে। মেয়েটির অতি উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ সহজেই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে, হয়তো সেই জন্যেই তার চোখ দেখতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু কোন মেয়ের দিকেই সে চোখ তুলে কখনও তাকায় না, তাই সসঙ্কোচে রঞ্জন দৃষ্টিকে নত করলো।

সনৎ চিত্রাকে বললো, 'চিত্রা, রঞ্জনের মনের শৈশব এখনও কাটেনি, ওকে মানুষ করবার ভার তোমার, বুঝলে?'

রঞ্জনের মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো, চিত্রা সেটা লক্ষ করে বললো, 'আঃ সনৎবাবু, আপনার সব সময় মুরুব্বীয়ানা, আপনার মত অকাল পক্ক না হওয়াটাই বুঝি অপরাধ?'

সশব্দে সনৎ হেসে উঠলো, বললো, 'কোথাও স্বরূপ ঢাকতে পারিনে এই তো হয়েছে মুস্কিল, কিন্তু তোমার পক্ষপাতিত্বটা চিত্রা—'

চিত্রা হাসিমুখে বললো, 'হ্যাঁ পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনার হাত থেকে রঞ্জন বাবুকে উদ্ধার করতে চাই।'

সনৎ বললো 'তবে এখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সনৎকুমারের বিদায়, রঞ্জনকুমারের প্রবেশ, কেমন ?'

—'পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন

আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশ মাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল।'

সনতের কণ্ঠস্বরের কারুণ্যে চিত্রা হেসে ফেললো। বললো, 'সনৎবাবু, আপনার আশা পূর্ণ হবার কোনই আশা নেই। আমি তা হলে এখন যাচ্ছি, গাড়ী এসে গেছে। নমস্কার রঞ্জনবাবু, আবার দেখা হবে।'

চঞ্চল পায়ে চিত্রা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সনৎ বললো, 'রঞ্জন, চলো একটু ঘুরে আসি।'

কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা রঞ্জন পড়ার টেবিলে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিল। সে চিন্তার কোন ধারাবাহিকতা নেই, শৃঙ্খলা নেই, এলোমেলো চিন্তা,—মা, লীলা, সনৎ সর্ব্বশেষে চিত্রা।

একসময়ে সচকিতে সে চোখ তুলে দেখলো, নিঃশব্দে

কৌতুকোজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। রঞ্জন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, বিব্রত ভাবে বললো, 'আপনি কতক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছেন? দেখতে পাইনি তো।'

চিত্রা অত্যন্ত মধুর করে বললো, 'তাতে আর কি এমন হয়েছে। এই সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে বসে কি এত ভাবছিলেন বলুনতো?'

অকস্মাৎ রঞ্জনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এই মাত্র আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

চিত্রা বললো, 'এই দেখুন, আমি কেমন আপনার মনোভাব ধরতে পেরেছি। ইনটুইশান, আমি জানতে পেরেছিলাম যে আপনি আমাকে ডাকছেন।'

'ডাকছি!' রঞ্জন বিস্ময়ের স্বরে বললো।

'তা নয়তো কি? আমি টেলিপ্যাথি জানি, আপনার মনের কথা যা' আপনি নিজেও জানেন না তা' আমি বুঝতে পারি।'

চিত্রার আয়ত ভাবময় চোখের দিকে চেয়ে রঞ্জন চোখ নীচু করলো। চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, বসুন।'

চিত্রা বললো, 'হ্যাঁ আমি বসি আর আপনার হোস্টেলের বন্ধুরা কেউ দেখে ফেলুক যে আপনার ঘরে আপনার চেয়ারে আমি বসে আছি, তা হলে আর আপনাকে টিকতে হবে না, রাতদিন আপনার পেছনে লেগে আপনাকে ঘরছাড়া করবে।

ভাগ্যিস্ অনেকে এখন বেরিয়ে গেছে। আর তা' ছাড়া আপনিতো জানেন ছেলেদের হোষ্টেলে মেয়েদের আসবার নিয়ম নেই, যদি একথা কোন রকমে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের কানে ওঠে, তা হলে দুজনের ভাগ্যেই রাজ টিকেট।' চিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠলো। সে হাসির মিষ্টতা রঞ্জনের মনকে ছুঁয়ে গেল। রঞ্জন বললো, 'জানেন যদি, তবে এলেন কেন ?'

চিত্রা সে কথার কোন উত্তর দিল না, রঞ্জনের টেবিলের ওপর তার খোলা খাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'বাব্বা, অঙ্ক দেখে আমার এত ভয় করে যে মনে হয় হিংস্র কোন জন্তু যেন নখ দাঁত বার করে আমায় আক্রমণ করতে আসছে।'

রঞ্জন জোরে হেসে উঠলো। বললো, 'হিংস্রই বটে, একটু অন্যমনস্ক হলে আর রক্ষে নেই, কিন্তু একটা প্রব্লেম সল্ভ করতে পারলে কি যে আনন্দ পাওয়া যায় তা' যদি বুঝতেন।' রঞ্জন ক্রমেই সহজ হয়ে আসছিল।

হঠাৎ একদিন রঞ্জন সনৎকে প্রশ্ন করে বসলো, 'আচ্ছা সনৎদা, আপনি চিত্রা দেবীকে বিয়ে করেন না কেন ? আমার তো মনে হয় চিত্রাদেবী আপনাকে ভালবাসেন আর আপনিও মনে হয়—' সনৎ হো হো করে হেসে ফেলে বললো, 'প্রশ্নটা ঠিক রঞ্জনেরই উপযুক্ত। বিয়ে করাটা কি ভালবাসার ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে একান্তই দরকার ? বিয়ে করলেই ভালবাসাটা দেশ ছেড়ে পালাবে সেই ভয়েই বিয়ে করিনে। আর তা' ছাড়া চিত্রা দেবী সুরূপা, সুগুণা, জগতে এতলোক থাকতে আমার

মত ছন্নছাড়াকে বিয়ে করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর আসবেই বা কেন ?'

রঞ্জন আবার বোকার মত প্রশ্ন করলো, 'বিয়ে করলে বুঝি ভালবাসা দেশ ছেড়ে পালায় ? তা হলে আদর্শ স্বামী রামচন্দ্র কেমন করে আদর্শ প্রেমিক হয়েছিলেন, সীতাকে হারিয়ে সোনার সীতার মধ্যে তাঁর প্রেমিকার আরাধনা করেছিলেন ?'

সনৎ এবার গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, 'রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়েই সীতাকে যথার্থ করে প্রেমের জগতে পেয়েছিলেন। বাল্মিকীর আশ্রমে সীতাকে বনবাস দিয়ে বিরহী রাম অন্তরে জাগিয়ে রেখেছিলেন তাঁর প্রেমের দেবতাকে, রাবণের অন্তঃপুর বাসিনী বিরহিণী সীতার জন্যে তাঁর অনির্ব্বাণ প্রেম অহোরহ সাধনা করেছিল প্রিয়াকে উদ্ধার চিন্তার মধ্যে, দ্বিধাবিভক্ত ধরিত্রীর অন্তরালে সীতা যখন আত্মবিলোপ করলেন তখন ধাতুমূর্ত্তি গড়ে তাতে প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন আদর্শ প্রেমিক রামচন্দ্র।

অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসে, কোন বাধা বিরোধের সম্মুখীন না হয়ে, সীতাকে বামে নিয়ে যদি রামচন্দ্র অনন্তকাল ধরে রাজ্যশাসন করতেন তা' হলে এ প্রেমকাব্যের সৃষ্টি হতো না রঞ্জন !'

রঞ্জন নিঃশব্দে রইলো। সনতের মুখে সে নতুন নতুন কথা শুনতে পায় আর তাই নিয়ে সে ভাবে।

একটু থেমে সনৎ আবার বললো, 'তুমি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের

কবিতা' পড়নি, তোমাকে এনে দেব। পড়ে দেখো লাবণ্য আর অমিত তাদের প্রেমকে বাস্তবের মলিন স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে অমৃতত্ব দেবার জন্যে চির বিরহকে বরণ করে নিয়েছিল, সেই বিরহের মধ্যেই ওরা সার্থকতা লাভ করেছিল, মিলনে নয়।

যাকে সত্যি করে ভালবাসবে তাকে কখনও বিয়ে করো না, তা' হলে জীবনের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধময় এই জগত বিস্বাদ হয়ে যাবে রঞ্জন !'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রঞ্জন বলে, 'কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ, যাঁরা সমাজ সৃষ্টি করে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ভালবাসা না থাকলে কি সৃষ্টি সম্ভব হোত ? এ আমার বিশ্বাস হয় না।'

রঞ্জনের মধ্যে প্রশ্ন এসেছে, বিশ্লেষণী মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে।

সনৎ বললো, 'যাঁরা সমাজ সৃষ্টি করে এসেছেন তাঁরা আমাদের অধঃস্তন পুরুষদের নমস্য, কারণ তাঁরা সৃষ্টি না করলে আমরা থাকতাম কোথায় ? কিন্তু রঞ্জন, তুমি ভুল করছো, এ জিনিস প্রেম নয় যা' ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। এ হচ্চে সাহচর্য্যের অভ্যাস, একসঙ্গে থাকার প্রীতিবন্ধন, সন্তান সন্ততি সৃষ্টি করার প্রেরণা, আর সবচেয়ে বেশী জৈব প্রকৃতির ধর্ম্ম। এ জিনিস প্রেম নয় রঞ্জন, কাঁচকে কাঞ্চন বলে ভুল কোরোনা।'

রঞ্জন চুপ করে থাকে। সনৎ আবার বলে, 'রঞ্জন, প্রেম

কোন বন্ধন স্বীকার করে না, সে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয় সে শুধু প্রেমিকা।

—গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যানামে শ্রান্তদেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র-নেত্র পাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

সনতের কণ্ঠে ছন্দ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল।

যুগযুগান্তর হতে যে বিশ্বপ্রিয়ার চরণতলে ধ্যানী তার তপের ফল সমর্পণ করে, যে অপূর্ব্বশোভনার কটাক্ষঘাতে ত্রিভূবন যৌবন চাঞ্চল্যে অধীর হয়, সুরসভাতলে নৃত্যপরা যে রূপসীর বিলোলহিল্লোল নর্ত্তনপুলক সিন্ধুর তরঙ্গে নাচে, ধরার অঞ্চলে শিহরণ তোলে; নৃত্যের হিন্দোলে যার স্তনহার হতে নভস্তলে খসে পড়া তারা আত্মহারা পুরুষের রক্তে উন্মাদনা জাগায়, সেই ত্রিলোক মোহিনীর বিশ্বপ্লাবী নৃত্যের প্লাবনে রঞ্জন তন্ময় হয়ে ডুবে গেল।

আবৃত্তির শেষে সনৎও দুই চোখ নিমীলিত করে ধ্যানমগ্নের মত বসে রইলো, তার ধ্যানের মাঝখানে জেগে রইলো চিত্রার অপূর্ব্ব দুটি চোখ, দীর্ঘ পল্লব সমাচ্ছন্ন, আয়ত, ভাবময়; মায়াময় যে চোখ মনের ভারকেন্দ্রকে তার অহোরহ দোলা দেয়।

সেদিন কলেজ কম্পাউণ্ডে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হতেই চিত্রা বল্‌ল, 'রঞ্জনবাবু, চলুননা একটু গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

অকুণ্ঠিত অনুরোধ! রঞ্জন বিব্রত হল, বিস্মিতও কম হল না, কিন্তু অনিচ্ছুক হয়েও আপত্তি করতে সঙ্কোচ বোধ করলো পাছে চিত্রা অসম্মান বোধ করে।

তার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবকে মোটেই প্রশ্রয় না দিয়ে চিত্রা আবার বললো, 'চলুন চলুন, আমি আর দেরি করতে পারিনে, বাড়ী ফিরতে দেরি হলে আমায় আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমি আগে গাড়ীতে গিয়ে বসি তারপর আপনি আসুন, দুজন একসঙ্গে বেরুলে বুঝতেই পারছেন আপনার কি অবস্থা হবে।' চিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠলো, মনে হল কে যেন সেতারের তার আলগোছে ছুঁয়ে গেল।

প্রায়ই রঞ্জন চিত্রার সঙ্গে বাহিরে যায়, কখনও গঙ্গার ধারে, কখনও ইডেন গার্ডেনে, কখনও চিত্রার প্রস্তাবিত কোন সিনেমায়। চিত্রার ইচ্ছা যেন দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মতই রঞ্জনের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দেয়, সে অসহায় ভাবে সেই ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফিরে এসে পড়ার টেবিলের দিকে চেয়ে মনে মনে সে ভয়ানক অনুতপ্ত হয়, পড়াশোনা হচ্চে না, বাবাকে অনেক দিন চিঠি লেখেনি, চিঠি লিখ্‌তে হবে।

অনেক দিন রাজীবলোচন রঞ্জনের চিঠি পান না, মনে করেন ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছে তাই চিঠিপত্র লেখার সময় পায়

না। কোন দিনই বাবার সঙ্গে ওর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল না, ছিল একমাত্র মায়ের সঙ্গেই, এখন তাঁর অভাবের পরে চিঠি বিরল হয়ে গেছে, রাজীবলোচনের দু'তিন খানা চিঠি পাবার পরে একখানা লেখে। মাঝে মাঝে রাজীবলোচন রঞ্জনকে অনুযোগ করে নিয়মিত চিঠি লেখার জন্যে অনুরোধ করেন, কিন্তু রঞ্জনের দ্বারা তা' আর হয়ে ওঠে না। সব কিছুতেই তার ঔদাসীন্য, সে সংকল্প করে বটে যে বাবাকে নিয়মিত চিঠি লিখ্‌বে কিন্তু কাজে তা' হয় না, বিলম্বিত সংক্ষিপ্ত চিঠিতে সংবাদ পেয়েই রাজীবলোচনকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন ওর মার সঙ্গে যে মনের সংযোগ ওর ছিল তা' ছিন্ন হয়ে গেছে তাই ওর আর চিঠি লিখ্‌তে মন লাগে না। রঞ্জন চিঠি লিখে জানায় সে ভাল আছে, শুধু এইটুকু মাত্র, আর কিছু নয়। নারায়ণী হরিহরের কাছ থেকে তার কুশল সংবাদ সংগ্রহ করেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক নির্জ্জন দিকে একখানা বেঞ্চে রঞ্জন আর চিত্রা পাশাপাশি বসে ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চিত্রা বললো, 'রঞ্জন বাবু, জীবনটা বড় মধুর হয় যদি ভালবাসার পাত্র চিরদিন কাছে কাছে থাকে। তবু মিলনের পরিপূর্ণতার মধ্যেও জেগে থাকে হারাবার ভয়, তাই অশান্ত মানুষ সমাজবন্ধনে বেঁধে প্রিয়কে সম্পূর্ণ আপনার করে নেবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে।'

রঞ্জন কোন উত্তর দিল না, নিঃশব্দে রইলো। চিত্রার কণ্ঠ

আবার বেজে উঠলো, 'কিন্তু সমাজ বন্ধনই কি সব সময়ে নিশ্চিন্ততা আনে ? যে বন্ধন একসময়ে মনে হয় কুসুমকোমল তাই আবার কোন সময়ে পায়ের শিকল হয়ে ওঠে যদি না মনের বন্ধন সত্য হয়।'

বাগানের এক প্রান্তে ছায়াচ্ছন্ন গাছের তলে শাখাপত্রের মর্ম্মরিত গুঞ্জনের মাঝখানে দুটি তরুণ তরুণী। বেলাশেষের মৃদু স্নিগ্ধ বাতাস তাদের দুজনের ললাটকে স্পর্শ করে এক অননুভূত সুখের আভাস বয়ে আনছিল। অনেকক্ষণ তারা নিঃশব্দে বসে রইলো, তেমনি শব্দহীন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে তাদের বেষ্টন করে ধরছিল। এক সময়ে চিত্রা আস্তে আস্তে রঞ্জনের কাঁধে মাথা রাখলো, গাঢ়স্বরে, অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলো, 'রঞ্জন !'

অননুভূতপূর্ব্ব এ স্পর্শ, অশ্রুতপূর্ব্ব এ কণ্ঠ ! একমুহূর্ত্তে রঞ্জনের সমস্ত দেহের শিরা উপশিরা যেন মদিরাময় এক অপূর্ব্ব আবেশে পূর্ণ হয়ে উঠলো, গালে চিত্রার ঘন চুলের কোমল স্পর্শ আর মৃদুমধুর গন্ধ তার চেতনাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। অজ্ঞাতসারে কখন সে বাঁহাত দিয়ে চিত্রার কটিদেশ সন্তর্পণে বেষ্টন করে ধরলো তা' সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

কতক্ষণ এমন ভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে কেটে গেছে তা' ওরা জানেনা, দিনশেষে গাছের শাখায় আশ্রিত পাখীর পাখার ঝাপ্‌টার শব্দে অকস্মাৎ চম্‌কে উঠে রঞ্জন আস্তে আস্তে চিত্রার কটিবেষ্টিত হাতখানি সরিয়ে নিল, মৃদুস্বরে বললো, 'চলুন, ফিরি।'

বাস্ ষ্টপেজ্-এ দাঁড়িয়ে আছে, সহসা পিঠে কার স্পর্শ পেয়ে রঞ্জন ফিরে তাকাল। ছেলেটির নাম সরোজ সোম, রঞ্জনের এক সতীর্থের বন্ধু, মাঝে মাঝে হোষ্টেলে দেখা হয়, রঞ্জনের সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। সরোজ বল্‌ল, 'রঞ্জন বাবু, আমার সঙ্গে আস্থন।'

বিস্মিত হয়ে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলো 'কোথায়?' সরোজ বল্‌ল, 'ভয় নেই, কিড্‌ন্যাপ করবো না, আমার সঙ্গে আস্থন।'

তার কণ্ঠে যেন একটা আদেশের স্থর, এবং এই আদেশ যে রঞ্জন অবহেলা করতে পারবে না এই নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ তার মুখে স্থস্পষ্ট। রঞ্জন বিনা বাক্যব্যয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলো। শহরের প্রান্তদেশে বাস্ থেকে নেমে পড়ে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে সরোজ রঞ্জনকে নিয়ে একটা ভাঙ্গা-চোরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকলো। সরোজের সঙ্গে একখানা ঘরে ঢুকে রঞ্জন দেখলো প্রশস্ত ঘরখানাতে কয়েকখানা চেয়ার অধিকার করে কয়েকটি ছেলে বসে আছে, প্রায় সকলেই তার সমবয়স্ক, ছুই একজন কিছু বড়ও হতে পারে।

ঘরে ঢুকতেই, রঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে তারা সকলেই সরোজের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফেরাল। সরোজ তাদের নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তর নিঃশব্দেই দিল। আর কেউ কিছু বললো না যার যার কাজ করতে লাগলো। তাদের সামনে একটা প্রকাণ্ড টেবিলে কতকগুলো কাগজ পত্র ছড়ানো ছিল, নিবিষ্ট

চিত্তে কেউ কেউ কাগজ দেখ্‌তে ব্যস্ত হলো, দু'চারজন মৃদুস্বরে কোন বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।

একটু দূরে দু'খানা চেয়ার টেনে সরোজ রঞ্জনকে বসিয়ে বললো, 'রঞ্জন বাবু, এটা আমাদের পার্টির অফিস, এখানে অনেক কিছু কাজ হয়।'

রঞ্জন প্রশ্ন করলো, 'তা তো বুঝলাম কিন্তু আমাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য কি ?'

সরোজ উত্তর দিল, 'আমাদের পার্টিতে আপনাকে নিতে চাই।'

রঞ্জন বিরক্ত ভাবে বললো, 'কিন্তু আমার তো আপনাদের পার্টিতে যোগ দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, আমায় যেতে দিন, আমার কাজ আছে।'

সরোজ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো 'দেখুন রঞ্জন বাবু, দশজনকে ফাঁকি দিয়ে একজনের জীবনে সুখভোগের কোন অধিকার নেই, এটা মানবতাসম্মত নীতি নয়।'

তার সঙ্গে একথার কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করতে না পেরে রঞ্জন বিমূঢ়ের মত সরোজের মুখের দিকে চেয়ে রইলো, একটু পরে বললো, 'আপনি আমাকে কি বলতে চান বুঝতে পারছিনে তো ?'

সরোজ আবার বললো, 'আপনি বিত্তবান্ ঘরের ছেলে। আপনি ভালো খাবার ভালো পরবার সুযোগ পাচ্ছেন, রোগে চিকিৎসার, পড়াশোনা করবার সব কিছু সুবিধা পেয়ে আসছেন,

যাদের এ সব কিছুরই নিদারুণ অভাব তাদের সম্বন্ধে কি আপনার কোন দায়িত্ব নেই ?'

রঞ্জন অবাক হয়ে বলে, 'আমি কি করতে পারি ? বড় জোর দুএকজনের অভাব হয়তো আংশিক ভাবে মোচন করতে পারি, তা ছাড়া—'

সরোজ হো হো করে হেসে উঠলো, বললো, 'রঞ্জন বাবু, এ কারু অভাব মোচনের প্রশ্ন নয় এ হচ্ছে অধিকার ভাগ করে নেবার প্রশ্ন। দেশজোড়া বিরাট দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই তাই অভাব মোচনের কথা তুলছেন, দয়া করে অভাব কেউ কারু মোচন করতে পারেনা, তাদের অধিকার তাদের ছেড়ে দিতে হয়। দুঃখীরা সত্যি সত্যি দুঃখী হতো না যদি আপনাদের মত সুখীরা তাদের বঞ্চনা না করতো।'

রঞ্জন এ অভিযোগের কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

সরোজ আবার বললো, 'আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ নিশ্চয়ই পড়েছেন, আনন্দ মঠের সন্তানদল মাতৃভূমির জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল আমাদের সন্তানদলও সেই স্বপ্নই দেখছে কিন্তু তা' বিজাতীয়ের অধিকার থেকে দেশমাকে কেড়ে নেওয়ার নয়, বিত্তবান্ স্বজাতীয়ের কবল থেকে অর্থবল কেড়ে নেওয়ার, বুঝতে পারছেন কি কিছু ?'

রঞ্জন নির্ব্বোধের মত চেয়ে থাকে। সরোজ বলে, 'আপনি তো অঙ্কে অনার্স নিয়েছেন, অনেক জটিল অঙ্ক আপনাকে

সমাধান করতে হয়। জীবনের এই জটিল অঙ্কের সমাধান আমাদের সকলকে মিলে করতে হবে কারু মুক্তি নেই।'

রঞ্জন সভয়ে বললো, 'আমাকে কি করতে হবে ?'

স্থির কণ্ঠে সরোজ আবার বললো, 'সব অঙ্কেরই সমাধান আছে। দু'য়ে দু'য়ে যেমন সুনিশ্চিত চার হয় এই জটিল প্রশ্নেরও তেমনি সুনিশ্চিত সমাধান আছে। আপনাকে সেই অঙ্কের সঙ্গে পরিচিত করাবার ভার আমার। আপাততঃ আপনার কিছু করবার নেই, শুধু আপনি আমাদের পার্টিতে নাম লিখিয়ে যাবেন, ক্রমে আপনাকে আপনার কাজ বুঝিয়ে দেব।'

এই বলে সরোজ রঞ্জনকে নিয়ে সেই প্রকাণ্ড টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল, একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যুবককে সম্বোধন করে বললো, 'সঞ্জয় দা, নতুন মেম্বারের নাম লিখে নিন্, রঞ্জন চৌধুরী।'

যুবকটি দীপ্ত চোখে রঞ্জনের দিকে তাকাল, কোনরকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি প্রশ্ন করলো, 'আমাদের এই পার্টি সম্বন্ধে সব কিছু গোপন রাখতে হবে আপনাকে, পারবেন ? মনের জোর আছে ?'

রঞ্জন ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল, তারপর সরোজের সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

সরোজের সঙ্গে গিয়ে নিম্নবিত্তদের বস্তির সঙ্গে যেদিন রঞ্জনের পরিচয় হলো সেদিন সে যেন এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করলো। এত দুঃখ যে জগতে আছে তা সে কখনও কল্পনা

করতে পারেনি। বর্ণনার অতীত এই দুঃখ কষ্ট অভাব নরনারী শিশু:নির্বিশেষে যাদের অবনতির সর্ব্বনিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছে, হিংসা, হানাহানি, মত্ততা, নারীলোলুপতার মত সর্ব্বরকমের কলুষ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে যাদের সমাজদেহ বিষজর্জ্জর করে তুলেছে, বাঁচার সংগ্রামে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত সেই অসহায় মানুষগুলি কেমন করে নিরুপায় ভাবে দিনের পর দিন মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে তা প্রত্যক্ষ দেখে রঞ্জন সমগ্র দেহমনে শিউরে উঠলো। সে অনুভব করতে লাগলো কতকগুলো ক্লেদাক্ত সরীসৃপ যেন সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে তার শ্বাসরোধ করে আনছে. অসহ্য ভয়ে রঞ্জন দৃঢ় করে দুই চোখ বুঁজলো।

সরোজ বললো, 'রঞ্জন বাবু, এই আমাদের সমাজের যথার্থরূপ, এরাই আমাদের আপনার জন, এরা প্রদীপের নীচেকার অন্ধকার। ঝাড় লণ্ঠনের সহস্র দীপের ঝলমলে আলো সত্যি নয়, ওরা ফুলঝুরির আলো; ওদের মধ্যে যে আগুন আছে তাতে তেজ নেই, দাহিকাশক্তি নেই, ওরা নিদারুণ মিথ্যে। কিন্তু রঞ্জন বাবু, এই নিদ্রিত কুম্ভকর্ণরা একদিন জাগবে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ হাতে ওই ঝাড় লণ্ঠনের বেলোয়ারী কাঁচ সেদিন এরা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, ফুলঝুরির মিথ্যে রোশনাই সেদিন একেবারে ছাই হয়ে নিভে যাবে, সেদিনের বেশী দেরি নেই।'

এতদিনে রঞ্জন উপলব্ধি করলো যথার্থ দুঃখ কাকে বলে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস সে এদের সঙ্গে মিশতে

লাগলো আর দুঃখের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকলো। এ দুঃখ কল্পনার বিলাস নয়, যার সত্যিকার দুঃখের সঙ্গে পরিচয় না থাকে সে-ই কাল্পনিক দুঃখের আশ্রয় নিয়ে দুঃখবাদকে ভোলায়। এ ভয়ঙ্কর, তীব্র জ্বালাময় বাস্তবের কাছে তা' যে কত অমূলক কত হাস্যকর তা' যতই রঞ্জন উপলব্ধি করতে লাগলো ততই তার মন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকলো।

একদিন বস্তি অঞ্চল থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জন শেয়ালদ' ষ্টেশনের মধ্যে ঢোকে। যেখানে পূর্ব্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছে তারই একপাশে দাঁড়ায়। আগে এরা বড় বড় রাস্তার দু'ধারে ফুটপাথের উপর ছেঁড়া চট, ছেঁড়া মাদুর আর চাটাইয়ের ছাউনি দিয়ে আস্তানা গড়ে নিয়েছিল সে বাসা তাদের ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডবে ভেঙ্গে গেছে। এবার রেল কোম্পানীর শেডের তলায় মাথা গুঁজে ঝড় জলের অত্যাচার থেকে তারা বেঁচে গেছে, তাদের বহুদিন সঞ্চিত হাঁড়ি কুড়ি, কাঁথান্যাকড়া, পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে তারা যাত্রী সাধারণের চলাচলের পথের ওপর সংসার পেতে বসেছে।

ক্ষুধার্ত্ত ছেলেমেয়েরা ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, বাসি রুটির টুকরো নিয়ে মারামারি করছে, ছেঁড়া ময়লা কাঁথার নীচে কেউ জ্বরে ধুঁকছে। একটা ছেলের হাতে চিনে বাদামের ঠোঙ্গা দেখে লোভী ছেলের দল তাকে আক্রমণ করলো, ধুলোয় ছড়িয়ে

গেল সব, মহানন্দে তাই কুড়িয়ে নিয়ে ওরা মুখে পুরে দিল, যার জিনিস সে ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। এই সব বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা রঞ্জনকে যেন কোন্ অচেনা জগতে পৌঁছে দেয়। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর সম্বিৎ পেয়ে আস্তে আস্তে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আবার পথ হাঁটতে থাকে।

রাস্তার এক পাশে বিরাট এক প্রাসাদের গায়ে হেলান দিয়ে একটা জীর্ণ শীর্ণ বুড়ী খিদের জ্বালায় ধুঁকছিল আর শীর্ণ কাঠির মত হাতখানা এগিয়ে দিয়ে পথচারীর করুণা ভিক্ষা করছিল। রঞ্জন বিহ্বল চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে, তারপর হাত বাড়িয়ে ওর প্রসারিত হাতে কিছু দেয়। পরমুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে লজ্জার মার খেয়ে সে সেখান থেকে সরে আসে। সরোজের কথা কানে বাজে,—দয়া করে অভাব কেউ কারু মোচন করতে পারে না, তাদের অধিকার তাদের ছেড়ে দিতে হয়।

রঞ্জন চলতে থাকে। খানিকটে দূরে গিয়ে দেখতে পায় একটা মেয়ে তার জীর্ণ মলিন কাপড়ে ঘোমটা টেনে পথের ধারে বসে আছে, তার সামনে ছেঁড়া নেকড়ার ওপর একটি কঙ্কালসার শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে। আগে কখনও রঞ্জন এমন করে দুঃখকে চোখ মেলে দেখেনি, কতদিন এই পথে সে হেঁটে গেছে কিন্তু কেমন করে এত মালিন্য এত কারুণ্য তার চোখ এড়িয়ে গেছে তা' ভাবতে তার বিস্ময় লাগে। ভাবে,—দুঃখীরা এত দুঃখী হতো না যদি তাদের মত সুখীরা ওদের বঞ্চনা না করতো।

অমার্জ্জনীয় অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত রঞ্জনের মন নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনা।

সরোজ রঞ্জনকে কার্লমার্কস্, এঙ্গেল্স্ এর মতবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে ওকে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কতকগুলো বই পড়তে দিল। বললো, 'রঞ্জনবাবু, পার্টির কাজ করতে হলে, কলেজে পড়া আপনার চলবে না। দু' নৌকোয় পা দেওয়া চলে না, আপনার এদিকেই অনেক পড়া শোনা করতে হবে।'

রঞ্জন বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলো, সামনেই তার বি. এ. পরীক্ষা।

সরোজ আবার বললো, 'আমাদের পার্টির অফিস ভারতবর্ষের সব প্রদেশে আছে, সঞ্জয় রায়ের ইচ্ছে আপনাকে সেই সব জায়গায় পাঠানো যাতে আপনার খানিকটে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, বহির্জগৎ সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান ভারি সঙ্কীর্ণ।'

রঞ্জনের মনে পড়লো একদিন সনৎও তাকে এই ধরণের কথাই বলেছিল,—জীবনের সম্বন্ধে তুমি বড় অজ্ঞ রঞ্জন!

রঞ্জন আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলো, 'সঞ্জয় রায় কে?'

সরোজ উত্তর দিল, 'আপনি সেদিন যাঁর কাছে নাম লিখিয়ে এলেন। ওঁর পরিচয় আমরা জানিনা, শুধু ওঁকে চিনি। উনিই এখানকার মস্তিষ্ক, বাংলাদেশে উনিই সবাইকে চালান, আমরা ওঁকে সঞ্জয়দা বলি, সবাই ওঁকে সমীহ করে চলে।'

দিনরাত রঞ্জন লাইব্রেরীতে বসে নানা বিষয়ের অজস্র বই পড়তে লাগলো। দেখলো বিস্তৃত এই পৃথিবীতে জানবার এত

কিছু আছে যা তার সারা জীবনেও সময়ে কুলিয়ে উঠবে না, তাই রঞ্জন এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করে না, স্নান খাওয়ার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পর্য্যন্ত পালন করে না, কলেজের বই খাতা তার টেবিলের এক কোণে পড়ে রইলো।

সনৎ তার এই ভাবান্তর লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়েছিল, একদিন প্রশ্ন করলো, 'রঞ্জন, তুমি কি পড়াশোনা ছেড়ে দিলে?'

রঞ্জন তার মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'সনৎ দা, ইউনিভার্সিটির নির্দ্দিষ্ট পড়া ছাড়া আরও অনেক কিছু জানবার আছে তা' বুঝতে পারছি, বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা মানুষের মনকে পঙ্গু করে রাখে, তাই কিছু কিছু পড়া-শোনা করতে হচ্ছে।'

সনৎ বললো, 'সর্ব্বনাশ, পরীক্ষার আগের মুহূর্ত্তে কি তোমার জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করবার সময় হোল? পরীক্ষাটা আগে দিয়ে নাও, নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবনকে গড়তে হয় রঞ্জন।'

রঞ্জনের মনে পড়লো, অনেক দিন আগে সনৎ একদিন বলেছিল, পরীক্ষায় পাস করাটাই কি জীবনের সর্ব্বার্থসাধক নাকি? জীবনের অনেক দিক্ আছে, অনেক কিছু পাবার আছে রঞ্জন, জীবনকে উপভোগ করতে হয়।

জীবনকে উপভোগের নতুন পন্থা আজ সে খুঁজে পেয়েছে, সে পথ দুর্ব্বার আকর্ষণে আজ তাকে টানছে, অজেয় তার শক্তি, মধুর তার আহ্বান; রঞ্জনের আর ছোট পরীক্ষা দেবার সময় নেই।

একদিন যাঁর কাছে আরাম চেয়েছিল সেই কামনার লজ্জায় আজ তাঁরি হাতে রণসজ্জা পরবার প্রার্থনা সে জানিয়েছে, প্রার্থনা করেছে নব নব আঘাতের বেদনা,—তা' সহ্য করবার মত বড় পরীক্ষা আজ তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যাবেলা একদিনও রঞ্জন ঘরে থাকে না, চিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয় না, কোথায় সে যায় চিত্রা বুঝতে পারে না। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে চিত্রা বললো, 'রঞ্জন বাবু, আপনার দেখা পাই না কেন? কি এত কাজে ব্যস্ত আছেন বলুন তো?'

রঞ্জন হাসিমুখে বলে, 'আপনার তো পরীক্ষা আছে, তাই আপনাকে পড়াশোনা করবার সুযোগ দিচ্ছি।'

চিত্রা ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কিন্তু আপনারও কি পরীক্ষা নেই? পড়াশোনার ক্ষতি করছেন কেন বলুন তো?'

রঞ্জন প্রথমে কোন উত্তর দেয় না, তার পর থেমে থেমে বলে, 'জীবনের পরিধিটাকে আরও একটু বড় করতে চাই চিত্রা দেবী, ইউনিভার্সিটির গণ্ডীটা বড় ছোট।'

চিত্রা কিছু বুঝতে পারে না, বলবার মত কোন কথা খুঁজে পায় না, বিস্মিত ব্যথিত হয়ে রঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকে।

রঞ্জন এক সময়ে সরোজকে বলল, 'সরোজ বাবু, আপনাদের উদ্দেশ্য ভালো বটে কিন্তু তার সিদ্ধির পথ তো সরল নয়।'

সরোজ অসঙ্কোচে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আমরা হিংসা দিয়ে

হিংসাকে উচ্ছেদ করতে চাই। আপনাদের অহিংসবাদের আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ওপর আমাদের কোনই আস্থা নেই।'

রঞ্জন বল্‌লো, 'কিন্তু সরোজ বাবু, আমার মনে হয়, হিংসার পথে কখনও শ্রেয়োলাভ হয় না, পথ যার কুটিল ফল তার সুন্দর হতে পারে না এই আমার বিশ্বাস। একশো বছর আগে কার্ল মার্কস্ শ্রেণী সংগ্রামের যে পন্থা নির্দ্দেশ করেছিলেন একশো বছর পরে সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সে পথ আজ সত্য নয়। মানুষ তো পশু নয়, সে মানুষ হয়ে মানুষকে হিংসা করবে কেন?'

এদিকে রঞ্জন গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও কিছু কিছু পড়াশোনা করেছে। প্রত্যেক মতবাদকে নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে সে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে। বুদ্ধের মৈত্রী, খ্রীষ্টের তিতিক্ষা, চৈতন্যের প্রেম, গান্ধীজির অহিংসায় যে সত্যোপলব্ধির পরম বিস্ময়, তা' তার চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে। প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনদর্শনের গহনগভীর অরণ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে আরও পড়ে, অনেক ভাবে।

রঞ্জন বললো, 'মানুষ যদি হিংসাই করবে তবে তার মনুষ্যত্ব রইলো কোথায়? হিংসার পথকে আমি নিন্দিত মনে করি।'

সরোজ কিছুক্ষণ অপলক স্থির দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো, 'হিংসার পথে কখনও শ্রেয়োলাভ হয় না, না রঞ্জন বাবু! কিন্তু দরিদ্রের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে খাচ্ছে, মুনাফা শিকারের লোভে, টাকার নেশায় কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ

সৃষ্টি করে, অসহায় মূক প্রাণীদের নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়ে যারা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফাঁপিয়ে তুলছে এরা কি করছে, হিংসা নয়? যে হিংসা দু'দশজন লোকের মৃত্যু ঘটায় তার চেয়ে সহস্রগুণ নিষ্ঠুর, সহস্রগুণ ভয়াবহ, লক্ষ লক্ষ মানুষের তিলে তিলে মৃত্যুর কারণ যারা তারা হিংস্র নয়?'

কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ, দুই চোখ তীব্র ঘৃণায় ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো, সরোজ বলতে লাগ্‌লো, 'রঞ্জনবাবু, আমি জেনেছি আপনি জমিদারের ছেলে, দুঃখের স্বাদ কখনও জানতে পারেন নি, তাই আপনি উদার, কিন্তু আমি তা' নই। শুনবেন কি আমার জীবনের কথা? সামান্য এক দরিদ্র কেরানীর ছেলে আমি, ক্ষিদের জ্বালায় দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেছি আমার মা-বাপ ভাইবোনদের; চাকুরীর চেষ্টায় বড়লোকদের দরজায় দরজায় ধন্না দিয়েছি, কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। রাস্তার কলের জল পেট ভরে খেয়ে পার্কের বেঞ্চে পড়ে দিনের পর দিন রাত কাটিয়েছি, এমনি করে এক সময় টি, বি, রোগের কবলে পড়েছিলাম। কিন্তু রঞ্জনবাবু, এত বড় দুঃখ যাদের সৃষ্টি আইনের হাত সেই অপরাধীদের ছুঁতে পারে না, আইনের চোখের ওপর বসে তারা পোলাও কালিয়া খায়, খাট পালংএ শোয়, শত শত বিজ্‌লী বাতি জ্বেলে রোশনাই করে।'

সরোজ চুপ করলো, কিন্তু তার কথার প্রতিধ্বনি যেন অশরীরী আত্মার মত বাতাসে বাতাসে হাহাকার ছড়াতে লাগ্‌লো, রঞ্জন নিস্পন্দ জড়ের মত বসে রইলো।

রঞ্জন পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো। কোথায় গেল কেউ জানলো না কেবল দেখা গেল তার হোষ্টেলের সিট্ খালি পড়ে আছে, তার বই খাতা জিনিস পত্র সবই পড়ে আছে, কেবল সে-ই নেই।

সনৎ আর চিত্রা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল, কোন কিছুই ধারণা করে উঠতে পারলো না। শঙ্কাতুর কণ্ঠে চিত্রা সনৎকে প্রশ্ন করলো, 'সনৎ বাবু, একি হোল? তাঁর জীবনের কোন হানি হয়নি তো?'

সনৎ বললো, 'না। আমার মনে হয় ও হঠাৎ বাড়ী চলে গেছে। ছেলেটি অত্যন্ত আবেগ প্রবণ, হয়তো বাড়ীর জন্যে মন কেমন করেছে—' চিত্রা আবেগের সঙ্গে বলে উঠলো, 'না, না, না, সনৎ বাবু, আপনি রঞ্জন বাবুকে চিনতে পারেন নি। তিনি অত্যন্ত স্থির চিত্ত, অত্যন্ত গভীর, অসাধারণ তিনি। সবটা না হলেও এই ক'মাসে তাঁকে আমি খানিকটে ধারণা করতে পেরেছি।' শ্রদ্ধার আবেগে চিত্রার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

পরিচিতের জগৎ থেকে রঞ্জন হারিয়ে গেল। সরোজদের পার্টি থেকেও হারিয়ে গেল সে। নানাদেশে যেখানে যেখানে সরোজদের পার্টি-অফিস আছে সব জায়গায় সরোজ রঞ্জনের সন্ধান নিলো কিন্তু কোথাও তার খোঁজ পাওয়া গেল না। বিপুলা এই পৃথিবীর কোন অনির্দ্দিষ্ট প্রান্তদেশে কোথায় সে তার ঈপ্সিত পথ খুঁজে ফিরতে লাগলো, কে জানে।

স্বল্প সঞ্চয় ফুরিয়ে আসতে লাগলো, মার শুষ্ক মুখ দেখে লীলা সবই বুঝতে পারছিল। বললো, 'মা, চল আমরা কলকাতায় যাই, লেখাপড়া তো বেশী শিখিনি তবু তোমার কাছে যতটুকু শিখেছি তারই সাহায্যে হয়তো কোন একটা কাজের যোগাড় করে নিতে পারবো, তার জন্যে রঞ্জুদার সাহায্যও পেতে পারবো ; এখানে তো মা আমাদের বন্ধু কেউ নেই। দিনের পর দিন এখানে পড়ে থেকে সময় কাটালে ভবিষ্যতে কি হবে বলতো ?'

নারায়ণীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখ্ লীলা, রঞ্জুর সংবাদ তো অনেক দিন জানি না। ও বাড়ীর হরি ঠাকুরের মুখে শুনলাম অনেক দিন তার খবর না পেয়ে চৌধুরী মশাই নাকি ব্যস্ত আছেন। জানি না বাছা আমার কেমন আছে, আমার মন বড় ব্যাকুল হচ্ছে লীলা।'

লীলা বললো, 'ওখানে গেলে তাঁর সংবাদ পাওয়া যাবে, আমি খুঁজে পাবই তাঁকে।'

১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া দেশে আর একবার উষ্ণ হয়ে উঠলো। নানাদিক থেকে নানারকম সংবাদ এসে পৌঁছাতে লাগলো, ঢাকা, বরিশালে মৃত্যুর তাণ্ডব আরম্ভ হয়ে গেল। নারায়ণী ভয় পেলেন, লীলাকে নিয়ে দেশে থাকা আর নিরাপদ মনে করলেন না, দেশের ঘরবাড়ী বিক্রী করে

দিয়ে দূরসম্পর্কিত এক আত্মীয়ের সাহায্যে নারায়ণী লীলাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এখানে বস্তি অঞ্চলে দুই খানা ঘর পাওয়া গেল, বস্তিটা ভদ্র বস্তি বলা চলে কারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সেখানে বাস করে।

দূর সম্পর্কিত আত্মীয়টির সঙ্গে গিয়ে লীলা রঞ্জনের খোঁজ করলো, কিন্তু তার হোষ্টেলে কেউ তার সন্ধান বলতে পারলো না। তার পর দিনের পর দিন সম্ভব অসম্ভব যেখানে যেখানে এতটুকু ক্ষীণ সূত্র সে আবিষ্কার করতে পারলো সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করলো, কিন্তু কতদিন কেটে গেল, মহানগরীর বিপুল জনারণ্যে তার বাঞ্ছিত জনের কোন উদ্দেশ সে করে উঠতে পারলো না। এবার লীলা চোখের সামনে কেবলই অন্ধকার দেখতে লাগলো।

লীলা নানা জায়গায় জীবিকার সন্ধান করতে থাকে, কাজ না করলে আর চলেনা। কিন্তু বিদ্যা নেই, কাজের অভিজ্ঞতা নেই, সব জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছু মেলে না। যদি বা কোথায়ও আশা পাওয়া যায় সেখানকার অবাঞ্ছিত পরিবেশ, করুণার ছদ্মবেশে হীনতার আভাস দেখ্‌তে পেয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এই কয়মাসে বাহিরের সম্বন্ধে লীলার অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে গেল। শেষে নিরুপায় হয়ে নারায়ণী বললেন, 'লীলা, তুই খুঁজে দেখ্‌ কোথায়ও রান্নার কাজ পাওয়া যায় কিনা, আমি রান্না করতে পারবো।'

ক্লিষ্ট স্বরে লীলা বলে, 'তুমি নয়, করতে হলে আমিই করবো মা।'

নারায়ণী বলেন, 'না লীলা, তোকে দিয়ে ও কাজ হবে না।'

লীলা আবার চাকুরীর সন্ধানে বেরোয়। সে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল, মার ম্লান মুখ তাকে সব সময় ব্যথিত করে, সে সংকল্প করে যেমন করে হোক্ কোন না কোন কাজ তাকে পেতে হবেই। এই মাত্র একটা জায়গা থেকে সে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, তারা অন্ততঃ পক্ষে ম্যাট্রিকপাস মেয়ে চায়।

একটা লাইট পোষ্টের নীচে সে খানিকক্ষণ বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর হাঁটতে আরম্ভ করলো। অন্যমনস্ক ভাবে সে পথ চলতে থাকে, দু'দিকের দোকান পসার গুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যায়। এত বড় প্রকাণ্ড শহর, এত কর্ম্ম-ব্যস্ততার স্রোত চারদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, এর কোন এক কোণে সে দাঁড়াবার স্থান পাচ্ছে না, তার আশ্চর্য্য লাগে।

একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনে সে দাঁড়ায়। বাহিরের শো কেসে নানা রকমের শাড়ীর বর্ণ বৈচিত্র্য, দোকানের মধ্যে মেয়ে পুরুষের ভিড়। মেয়েরা শাড়ী পছন্দ করছে, কেউ কেউ কিনছে কেউ বা অপছন্দে নেমে চলে যাচ্ছে, লীলা এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখে। একজন সেলস্‌ম্যান তাকে কিছুক্ষণ থেকে লক্ষ করছিল, এগিয়ে এসে বললো, 'আসুন না, ভেতরে এসে দেখুন, অনেক ডিজাইনের শাড়ী আমাদের ষ্টকে আছে

লীলা অপ্রস্তুত হয়ে সঙ্কুচিত ভাবে বললো, 'না, কিনবো না আমি কিছু কিন্তু—' বিস্ময়াপন্ন হয়ে লোকটি বললো, 'কি বলছেন, বলুন।'

লীলা হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলে ফেললো, 'আপনাদের এখানে কি কোন কাজ আছে?' মেয়েটির অজ্ঞতা দেখে লোকটি অবাক হল, তারপর সিঁড়ি থেকে ফুট পাথে নেমে এসে বললো, 'আমাদের এখানে তো মেয়েদের কোন কাজ নেই তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন অন্য কোথাও সেল্‌স্ গার্লএর কাজ করতে পারেন, আপনাকে আমি সে বিষয়ে সাহায্য করতে পারি।'

লীলা সাগ্রহে বললো, 'যে কোন কাজ পেলেই আমি করতে পারি, আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায় সাহায্য করেন।'

ভদ্রলোক বললো, 'গভর্ণমেণ্ট সেল্‌স্ এম্‌পোরিয়ামএ আমার বোন্ সেল্‌স গার্ল, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, তাকে দিয়ে আপনার কোন সুবিধে হয় কিনা দেখুন। যে কোনদিন বেলা আটটার আগে যদি আপনি এখানে আসেন আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, আটটার পরে আমাদের এখানে কাজ থাকে।'

অতসী অনেক চেষ্টা করলো তবু সেল্‌স্ এম্‌পোরিয়ামএ লীলা কাজ পেলো না, কিন্তু তার একটা লাভ হলো অতসী দি। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথে পথে ঘুরে লীলা ক্লান্ত হয়েছিল, অতসীকে পেয়ে সে যেন একটি সহায় পেল। অতসী বললো, 'এখানে আমার সঙ্গে থেকে তুমি কাজ কর্ম্ম শিখে নাও তারপর তোমার

জন্যে আমি সুপারিশ করতে পারব। তোমার জন্যে আমি অন্য কোনও রকম চেষ্টা দেখি, এখানে তো আর লোক নিতে চায় না, কি করি বল? তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়ীটা চিনে আসবে চল।' অতসীর ব্যবহারের আন্তরিকতা লীলার মনকে স্পর্শ করে।

অতসী লীলাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। দু খানা ঘর, অতসী তাকে এমন পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়েছে যে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়।

ঘরে ঢুকেই অতসী ডাকলো, 'চাঁদু, চাঁদ মণি, শিগ্‌গির আয়, এসে দেখ্‌ তোর মাসী এসেছে।' তিন চার বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে ছুটে এল, বললো, 'কই মা? কই মা?' অতসী তাকে দু হাতে লুফে বুকের কাছে তুলে নিল, মুখখানি তুলে ধরে বললো, 'দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে বোকা ছেলে, এই তো।' ছেলে সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার লীলার দিকে একবার মার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। মা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললো, 'যা মাসীর কাছে, তাকে ধরে রাখবি যেন পালিয়ে না যায়, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।'

লীলা হেসে ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'চাঁদ মণি, তোমার নামটি তো বেশ।' ছেলে ততক্ষণে সপ্রতিভ হয়েছে, লীলার কাপড়ের প্রান্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে তার কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, বলে, 'তুমি মাসী?' লীলা সস্নেহে বললো, 'হ্যাঁ আমি মাসী, আমাকে তুমি ভালবাসবে তো?' ছেলে এ

প্রশ্নে বিব্রত হল, মা বাবাকে ছাড়া মাসীকেও ভালবাসা যায় কিনা এ তার ধারণা নেই, সে চুপ করে থাকে। অতসী ঘরে ঢুকে বলে 'ওরে বোকা ছেলে, মাসীকে ভালবাসতে হয় তা জানিস্‌নে ?'

এই সময়ে সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্‌ পায়ের শব্দ শুনে লীলা সচকিতে মুখ তোলে, ছুটতে ছুটতে দু'তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ঘরে এসে ঢোকে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবক, লীলাকে ঘরের মধ্যে দেখেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অতসী চেঁচিয়ে বললো, 'আরে এসো, এসো, অত ঘাব্‌ড়াবার কিছু নেই, এ আমার বোন লীলা। দেখ্‌ ভাই, এই একটি বুড়ো খোকা এঁকে নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা, বাড়ীতে এলে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয় কোন্‌টা ভাঙ্গে, কোন্‌টা ফেলে। স্পোর্টস্‌ম্যান কিনা, সব সময় খেলার মুড্‌এ থাকে, আমার এই ছোট ঘরখানাকে যেন ফুটবল খেলার মাঠ পেয়েছে। কাঁচের গেলাস যে কত ভাঙ্গে তার ঠিক নেই, ওই দেখ্‌না ছেলের সঙ্গে বল্‌ খেলতে আলমারীর কাঁচটা কেমন করে ভেঙ্গেছে।' লীলা হেসে উঠ্‌লো। হিরণের সঙ্গে লীলার পরিচয় হলো, চমৎকার লোক, প্রাণবন্ত, হাসিখুসী। অতসীও তাই, এমন প্রাণোচ্ছলা মেয়ে লীলা আর দেখেনি। তার চলায় আনন্দ, বলায় আনন্দ, সর্ব্বাঙ্গে তার যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। প্রাণরসে ভরপূর এই পরিবেশকে লীলার ভারি ভালো লাগলো।

লীলা মাঝে মাঝে আসে, তার নিজের প্রয়োজনেও বটে, ভালো লাগে বলেও।

ভাল করে পরিচয় হলে হিরণ একদিন তার ছেলেকে বললো, 'চাঁদু, ইনি তোমার মাসী নন্ পিসী, ওঁকে পিসী বলে ডেকো।'

অতসী প্রতিবাদ করে, 'বাঃ আমার বোনকে কেড়ে নেবার ফন্দী, ওকে আমি ছাড়বো না। তোমার ইচ্ছে থাকে আর একটি বোন খুঁজে নাওগে, নারে চাঁদমণি, ও তোর মাসী।'

ছেলে বিভ্রান্ত হয়ে একবার মার একবার বাবার একবার লীলার মুখের দিকে তাকায়, লীলা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'আমি তোমার মাসীও হই পিসীও হই চাঁদমণি।' হিরণ বললো, 'বেচারীকে উভয় সঙ্কটে ফেললেন আপনি দেখ্‌চি; মাসী পিসী দুই-ই যদি হন তবে অতসীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি দাঁড়াল বলুন তো?'

নিজের রসিকতায় সে হো হো করে হেসে ওঠে।

লীলা হিরণকে দাদা বলে। এদের জীবনযাত্রা তার ভারি ভালো লাগে। জীবনশিল্পকে কেমন করে রচনা করতে হয় তার কৌশল এরা আয়ত্ত করেছে। ওদের সংসারটিকে যেন ওরা একটি ফুলের বাগানের মত করে গড়ে তুলেছে, তাদের সুখের সৌরভে সে বাগান ভরে আছে, পথচারী যে সেই বাগানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সেও সেই সৌরভে স্নিগ্ধ হয়।

একদিন অতসী বলে, 'দেখ্ ভাই, ও আমার জীবনটাকে

একেবারে মাটি করেছে। ভেবেছিলাম পড়াশোনা করব, বেশ স্বাধীন ভাবে থাকবো, কিন্তু ওর খপ্পরে পড়ে গেলাম।'

হিরণ বললো, 'বিশ্বাস করোনা লীলা, কেঁদে কেটে আমাকে বললো, আমি আর পড়বো না, পড়ায় আমার মন বসেনা, তুমি আমায় বিয়ে কর।'

অতসী বলে উঠলো, 'ইস্ কি নির্জ্জলা মিথ্যেবাদী, আমি কি এমনি নির্লজ্জ যে ওই কথা বলবো?'

হিরণ তার স্বাভাবিক উচ্চহাসি হেসে বললো, 'ও, ভুল হয়ে গেছে, আমিই বলেছিলাম, অতসী, আমি খেলাধুলা ছেড়ে দিয়ে শিষ্ট শান্ত হয়েছি এবার তুমি আমায় দয়া কর।'

ওদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে সেই সেল্‌স্‌ম্যান ভদ্রলোক আসেন, ইনি অতসীর খুড়তুতো ভাই। শান্ত, গম্ভীর প্রকৃতি, হিরণের ঠিক বিপরীত।

হিরণ বলে, 'ওঃ, দুনিয়ার যত দুশ্চিন্তার বোঝা যেন প্রশান্ত মাথায় করে বইছে, তোমার মুখের দিকে চাইলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে প্রশান্ত, একটু হাসোনা দেখি কেমন দেখতে হয়।' লীলার সামনে প্রশান্ত লজ্জিত হয়। অতসী বলে 'আহা, তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে, আমার দাদার সঙ্গে কি তোমার তুলনা হয়? তুমি হচ্ছ একটি অদ্ভুত লোক, তোমার জুড়ি মেলা ভার।'

প্রশান্ত বলে, 'হাসিটা একটা দুর্ব্বলতা হিরণ, তাকে চেক্

করতে না পারাটা অন্যায়, প্রয়োজন হলে হাসতে হবে, অকারণে নয়।'

হিরণ বলে, 'ওঃ প্রশান্ত, তুমি মানুষ খুন করতে পার। মেপে মেপে হাসতে হবে তা' আমি পারব না, এর চেয়ে আমার ফাঁসির হুকুম দাও আমি হাসতে হাসতে প্রাণ দেব। কে যেন একজন বড়লোক বলেছিলেন, যে গান ভালবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে। হাসিটা তো মনের গান, হাসির রূপ নিয়ে আসে, তাকে চেক করতে হলে মানুষ মরে যাবে, দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে যাবে প্রশান্ত, ঘোর অন্ধকার হয়ে যাবে।' তার প্রাণখোলা হাসিতে সারাঘর মুখরিত হয়ে ওঠে।

অতসী বললো, 'দোহাই তোমার, তোমার আর কাব্য সৃষ্টি করে কাজ নেই, লেক্‌চারটা একটু থামাও তো দেখি।'

হিরণ এবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'না অতসী, অন্ততঃ ও দুর্নামটা আমার নেই, আমি কবিদের মত অত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে পারিনে, যা বলি তা সোজাসুজি বলি। যেমন কখনো কখনো তোমাকে বলি, অতসী, আজ চপ্‌টা কেমন আলুনী হয়েছে, বেগুন ভাজাটা পোড়া পোড়া, আর আলুগুলো অসিদ্ধ, কাব্য করে বলতে পারিনে প্রেয়সী, তোমার হাতের রান্না তো রান্না নয় যেন স্বর্গের অমৃত।' হিরণ হাসতে থাকে আর অতসী ধৈর্য্য হারিয়ে রেগে যায়। বলে, 'উঃ কি বিশ্বনিন্দুক রে বাবা, এত যত্ন করে খাবার তৈরি করি তার জন্যে এককোঁটা কৃতজ্ঞতা নেই, উল্টে আবার বদনাম। লীলা তো

নতুন এসেছে, তোমার ধরণ ধারণ কিছুই জানে না, ও ভাববে সত্যি বুঝি আমি তোমাকে পোড়া ছেঁচ্‌ড়া খেতে দি।'

হিরণ স্বর নামিয়ে জোড় হাত করে বলে, 'প্রিয়ে, দেহি পদপল্লবমুদারম্‌। তুমি রাগ করলে আমি কোথায় যাই বলতো? ত্রিভুবনে যেখানেই যাই তুমি আমার পেছন পেছন তাড়া করে বেড়াবে।' ঘরসুদ্ধ সবাই হাসলো।

অতসী বললো, 'দেখ্‌ছো ভাই লীলা, এ ভয়ানক লোকটির পাল্লায় পড়লে আর কারু উদ্ধার নেই, ওকে যত এড়িয়ে চলতে পার। চাঁতুর পিসী হয়ে আর তোমার দরকার নেই, মাসী হয়েই থাকো।'

হিরণ রেগে গিয়ে বলে, 'দেখো অতসী, আমার বোনকে ভাঙ্গিয়ে নেবার চেষ্টা আমি বরদাস্ত করবো না। চাঁদু, চাঁদমণি, এদিকে আয়তো।' চাঁদু একটা কলের রেলগাড়ীতে চাবি দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সেটাকে ঠেলে ঠেলে চালাচ্ছিল, ছুটে এসে বললো, 'কি বাবা।' হিরণ তাকে ছোট্ট পাখীটির মত দুহাতে লুফে তুলে নিল, তার কানে কানে বললো, 'বলতো বাবা, উনি তোমার কে হন?'

চাঁদু বললো, 'মাসী।' খিলখিল করে হেসে উঠে অতসী বললো, 'কেমন মশাই, হলতো? বিচারকটি ছোট্ট হলে কি হবে, ওর আইন জ্ঞান আছে, আগে কার অধিকারে জিনিসটি এসেছে তা ও জানে। লীলার সঙ্গে কি আগে তোমার চেনা হয়েছিল? আগে আমার,—তাই জিনিসটা আমার ভাগেই পড়ে।'

হিরণ মুখটা বিজ্ঞ বিচারকের মত গম্ভীর করে বললো, 'আগে চেনা হবার সূত্র ধরে যদি জিনিসটার অধিকার বিচার করা হয় তা হলেতো এ বিষয়ে প্রশান্তকেই প্রায়োরিটি দিতে হয় অতসী,—তোমাকে নয়। কি বল হে প্রশান্ত ?'

প্রশান্ত অত্যন্ত লজ্জিত হয়, লীলা বিব্রত হয়। অতসী ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'আঃ থামতো, তোমার মত মুখফোঁড় মানুষ আমি জন্মে দেখিনি। আয় ভাই লীলা, আমরা পালাই, বলেছিতো এ লোকটির পাল্লায় পড়লে নাজেহাল করে ছাড়বে।' লীলার হাত ধরে টেনে নিয়ে অতসী ঘর থেকে পালায়। হিরণ হাসতে হাসতে চাঁদুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'যাও তো বাবা, তোমার রেলগাড়ী নিয়ে খেলা করগে।'

মাস দুই পরে একদিন অতসী লীলাকে বলে, 'লীলা, তোকে আমি একটা অনুরোধ করবো যদি রাখিস্।' লীলা প্রশ্নসূচক চোখে অতসীর মুখের দিকে তাকায়। অতসী বলে, 'আমার ওই উদাসীন দাদাটিকে ঘরবাসী করতে পারিস্ ? ও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয় না, বলে, বিয়ে করে কি হবে, এই তো বেশ আছি। আমার ভাই ব'লে নয়, সত্যি বলছি লীলা, ওর মত ভালোমানুষ দুনিয়ায় দুটি নেই। কারু কোন কথাতে নেই, লোকের উপকার করতে পারলে যেন নিজেই কৃতার্থ হয়। তুইও তার প্রমাণ পেয়েছিস্।'

লীলা অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে। একটু পরে বলে, 'কিন্তু আমি যে বিয়ে করবো না ঠিক করেছি অতসী দি।'

অতসী বললো, 'ওমা বলিস্ কি! নিঃসঙ্গ জীবন কি মানুষের কাটে? শেষে দেখবি কিচ্ছু ভালো লাগবে না, নিজেকে কেমন অসহায় মনে হবে। আমি যখন কলেজে পড়তাম আমাদের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছি অত্যন্ত খারাপ দেখতে বলে তাঁর বিয়ে হয়নি। তাঁকে কখনও হাসতে দেখিনি, সব সময় মেজাজ খারাপ করেই আছেন। জীবনে কোন আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, সত্যি তাঁকে দেখে আমার তখন ভারি করুণা হত। তুই এ মত্‌লবটা ছেড়ে দে ভাই, দেখবি জীবন কত সুন্দর হবে।'

লীলা চুপ করে থাকে। অতসী তো জানে না জীবন তার ভরে আছে কী সৌন্দর্য্যে, কী ঐশ্বর্য্যে যার নীরন্ধ্র পরিপূর্ণতার মধ্যে এতটুকু আর স্থান নেই।

দিনের পর দিন ওই একই কথা, একই অনুরোধ লীলার মানসিক পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে, এদিকে তার অস্বীকৃতিতে অতসী মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হয়। নিরুপায় হয়ে লীলা ওদের বাড়ীতে আসা প্রায় বন্ধ করে দিল। অতসী বলে, 'তুমি তো ভাই দেখছি আজকাল আমাদের বর্জ্জনই করেছো, কি অপরাধ করেছি বলতো?'

লীলা একটু ম্লান হাসি হাসে।

ভোর হতে না হতে পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি আর হাঁপানি রোগীর কাতরানির শব্দে নারায়ণীর

ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর নিজের ঘর থেকেই তিনি অনুভব করতে থাকেন বস্তিজীবনের প্রত্যেক ঘরে ঘরে সারা দিনের দিনযাত্রা আরম্ভ হয়ে যায়, ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একটানা জীবনসংগ্রাম, ছোট বড় নানা অভাব অভিযোগের কঠিন দিনযাত্রা।

অন্যমনস্ক ভাবে এটা সেটা ছোট সংসারের খুঁটিনাটি তিনি সারতে থাকেন এর মধ্যে লীলা জেগে ওঠে, বিছানা ছেড়ে ছোট বালতি নিয়ে সে জল ধরতে যায়।

লম্বা সারির ঘরগুলোর মাঝামাঝি জায়গায় একটা জলের কল, সারা বস্তির অধিবাসীর খাবার জল রান্নার জল নেবার জন্যে দু'বেলা সেখানে কিউ লেগে যায়। পুরুষেরা অবশ্য বাইরের রাস্তার কলের জলে স্নান সারে কিন্তু মেয়েদের স্নানের জন্যেও ওই কলের জলের ওপরই নির্ভর করতে হয়, শেষরাত থেকে তাই কলতলায় ভিড় জমে।

লীলা একপাশে সরে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশেই একখানা ঘর, তার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটি বউ বলে ওঠে, 'এগিয়ে যাওনা ভাই, তুমি অম্‌নি করে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকলে কি আর কল পাবে? সবাই জল ধরবে, নাইবে। তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখ্‌চি।' মেয়েটি রুগ্ন, ঘরের ভেতরে জানালার নীচে তার তক্তপোষে শুয়ে থাকে আর দুই বেলা এই জল সঞ্চয়ন দেখে। লীলাদের পাশের ঘরের মেয়ে সেবা আসে, লীলার হাতের বালতিটা টেনে নেয়, বলে, 'বাব্বা,

ধন্যি মেয়ে বটে, সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ ? নাও এবার ভর্ত্তি করে দিলাম, নিয়ে চলে যাও অম্‌নি খাবার জলের কলসীটাও নিয়ে এসো।'

এর পর তোলা উনুনে ঘরে ঘরে আঁচ দেওয়া হয়, ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। অফিস ইস্কুলের তাড়ায় রান্নার ব্যস্ততা, চেঁচামিচি, বকাবকি, বাসনপত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ, বাতাসে ভেসে আসা রান্নার সুগন্ধ, ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের কান্নার কলরব এই সব মিশিয়ে এক বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা লীলাকে মুহ্যমান করে। এরই মধ্যে এক সময় পাশের ঘরে সেবার ছোট বোন পুঁটির আর্ত্তচিৎকারে সচকিত হয়ে লীলা ছুটে যায়, মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়। মার খেয়ে মেয়েটা চিলের মত চেঁচাচ্ছে আর তেম্‌নি সেবার বকুনি অবিশ্রাম ভাবে চলেছে, 'ছিঁড়ে খা তোরা আমায়, আর পারিনে তোদের জ্বালায়।'

পুঁটিকে কোলে নিয়ে লীলা তাদের ঘরে চলে আসে, খাবার জিনিস দিয়ে ভোলায়, সেবার পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ কচি গালে ফুটে উঠেছে দেখে ব্যথিত মনে তাতে হাত বুলিয়ে দেয়।

দরিদ্রের সংসারে মা ষষ্ঠীর কৃপা থাকে, পাঁচটি ভাইবোন সেবার। বাপ কোন মুদীর দোকানে খাতা লেখে, সকাল বেলা তার ভাত জল দেওয়া, রুগ্ন মায়ের পথ্য তৈরি করা, ছোট ভাই-বোনদের কান্নাকাটি থামাবার জন্যে মুড়ি চিঁড়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সেবার শান্তি নেই। অপেক্ষাকৃত বড় ভাইবোনদের

ক্ষুধাতুর সংযমশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেবার মন পীড়িত হতে থাকে, ছোটরা ততক্ষণ কানফাটা চিৎকারে ক্ষুদ্র ঘরখানি মুখরিত করে তোলে; হাঁপানির রোগী মা হাঁপানির টানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণস্বরে গালাগালি করতে থাকে। সেবা ত্রস্ত হাতে একবার ছোটদের সামলাতে ব্যস্ত হয় আবার ছুটে গিয়ে মার বুকে কবিরাজী তেল মালিশ করে। মা অনুযোগ করে, 'মরে যাচ্ছি তাও তোর দেখবার সময় হয় না।' সেবা তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দেয়, 'মর না কেন, মরলে তো তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি।' লীলা শিউরে উঠে দুইহাতে কান ঢাকে। ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে তাদের ঘরে নিয়ে যায়, নারায়ণী যা' কিছু ঘরে থাকে তাই খেতে দিয়ে ওদের শান্ত করেন।

সেবা বালবিধবা। বয়সে সে লীলার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। তার জীবনের সব কাহিনী সে অকপটে লীলার কাছে বলেছিল। নোয়াখালি জেলার এক গ্রামে তাদের বাড়ী ছিল, গ্রাম্য গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে। ক্ষেতে ধান ছিল, ঘরে ঢেঁকি ছিল, বিলাসিতার সুযোগ না পাক্ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তাদের অভাব ছিলনা, কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধলো। উনিশ শ, ছেচল্লিশ সালে সারাদেশ যখন রক্তের নেশায় পাগল হয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি করে মরতে লাগলো, মা বোনের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো, ভয়সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা তখন যা' কিছু পারলো বেচে কিনে তাদের বহু পুরুষের ভিটের ওপর চোখের

জলের সাক্ষর রেখে নিরাপদ জীবন যাপনের আশায় গ্রাম থেকে বিদায় নিল।

সেবা তখন বড় হয়েছে। খোলা মাঠ ঘাটের হাওয়া আর ক্ষেতের ধানের ভাত তাকে অকৃপণ হাতে স্বাস্থ্য দিয়েছিল তাই তার বাপ মায়ের চোখে ঘুম ছিল না। নিশীথ রাতের অন্ধকারে ঘরের দরমার বেড়া কেটে কোন পৈশাচিক উল্লাস পাছে অতর্কিত আক্রমণে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সেই ভয়ে তার মা বাপ রাত্রির পর রাত্রি জেগে বসে কাটিয়েছিল। তারপর নিরুপায় হয়ে তারাও একদিন সব ফেলে রেখে কলকাতা সহরে এসে এই বস্তির ঘরে আশ্রয় নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

কিন্তু শান্তি নেই। তার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য, দুরন্ত যৌবন লোকের চোখকে আকৃষ্ট করে। সে নিজেও লজ্জায় মরে যায়, বাপ মায়েরও দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না, তার বিয়ের চেষ্টা হতে লাগলো। কিন্তু টাকা দিয়ে বিয়ে দেবার সঙ্গতি তার বাপের ছিল না, কত সম্বন্ধ এল গেল টাকা বিনে দয়া করে কেউ তাকে পার করলো না। তারপর এক সময়ে এ সমস্যাও গৌণ হয়ে গেল, কলকাতা সহরে বসে খেয়ে আর্থিক সঞ্চয় ফুরিয়ে এল তখন সব কিছুকে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়ালো ভয়াবহ অন্নচিন্তা। বাপ মা ভাইবোনদের খাইয়ে বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে না আধপেটা খেয়ে সেবা শীর্ণ হতে লাগলো।

সেবা ভেবেছিল গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োয় কিন্তু প্রাণের মায়ায় তা পারেনি। এই সময়ে অভাবিত ভাবে তার

বিয়ে হয়ে গেল। টাকা দিতে হয়নি, তার লুব্ধ পিতার হাতে অনেক টাকা গুণে দিয়ে তারাই কিনে নিয়ে গেল সেবাকে। বাপ উৎফুল্ল, মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো, যাক্, সেবা এতদিনে ঘর পেলো। রুগ্ন বৃদ্ধ তার স্বামী, তবু সেবাও বেঁচে গিয়েছিল, আর কিছু না হোক তার স্বামীর ঘরে খাবার অভাব ছিল না, খিদের জ্বালা থেকে সে পরিত্রাণ পেল।

কিন্তু খিদের জ্বালা যখন মিটলো, দেহের জ্বালা তখন প্রবল। পতিব্রতা হয়ে দিনরাত রুগ্ন স্বামীর সেবায় নিজেকে সে ডুবিয়ে রাখলো তবু বুকের ভেতরকার শূন্যতার হাহাকারকে কিছুতেই সে শান্ত করতে পারে না। মনের যখন এই অবস্থা,—ঝড়ের মুখে নোঙ্গর ছেঁড়া নৌকোর মত মন তার যখন আছাড়ি পিছাড়ি করছে তখন অবলম্বন দিতে যে এগিয়ে এল সে তার স্বামীর যুবক ভাইপো, ওই বাড়ীতেই থেকে সে পড়াশোনা করতো। সেই দিল তাকে সহানুভূতি, দিল ভালবাসা, তারই কাছে পেল সে বেঁচে থাকবার মন্ত্র। সেদিন কালো পৃথিবী তার চোখে আলোময় হয়ে গিয়েছিল, তিক্তস্বাদ জীবন মনে হয়েছিল মধুময়। কিন্তু সে আর কদিন?

তার বিয়ের বছর দুই পরে তার রুগ্ন বৃদ্ধ স্বামী তাকে মুক্তি দিয়ে পরপারে চলে গেল। তখন সেই যুবক ভাসুরপোই তাকে আশ্রয় দিতে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু নির্ব্বোধ তার বাপ কলঙ্কের ভয়ে তাকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনলো। ভরা যৌবনকে তার ব্যর্থ করে দিয়ে সমাজের নিন্দের ভয়ে তৃষাতুর ওষ্ঠের

কাছ থেকে তার নিষ্ঠুর হাতে যে জলের পাত্র কেড়ে নিল সে নির্ব্বোধ নয় ত কি ? নির্ম্মম সমাজ কি দিল আমাকে ? বেড়া আগুনে শুধু পুড়িয়ে মারছে তিলে তিলে, আমার দেহে মনে জ্বলছে আগুন, আর আমি সইতে পারিনে, আর আমি সইতে পারিনে।

শূন্যতার অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে বুভুক্ষার নগ্নমূর্ত্তি দেখে আতঙ্কে লীলা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। কঠিন এই সমস্যার সমাধান কোথায় তা' লীলার জ্ঞানের আয়ত্তে নেই, সারারাত এই আতঙ্কের বিভীষিকা দুঃস্বপ্ন এনে দিয়েছিল তার চোখে, সে ঘুমোতে পারেনি। স্বপ্নের ঘোরে সে দেখছিল, কারা যেন কাকে শক্ত রশি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করছে, সেই আঘাতের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল তার সকল দেহ, বিবর্ণ নীল হয়ে গিয়েছিল তার মুখ, সে মুখ যেন সেবার।

সেবার জীবনের কাহিনী শুনে নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে লীলা নিজের মনে স্বীকার করেছিল যে এ মেয়েটি তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখী। লীলা যাকে ভালবেসেছিল তার অপরিসীম ভালবাসা পেয়ে সার্থক হয়ে গেছে সে, আর কিছুতো তার চাইবার নেই। এর চেয়ে মহত্তর আর কি প্রার্থনীয় আছে, যার জন্যে তার মন রাত্রিদিন ঝুরে মরছে ? প্রাপ্তির তো তার সীমা নেই, আজও তার হৃদয়ের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ, সেই পূর্ণপাত্রের সুধা তার জীবনকে প্লাবন করে

অহর্নিশি উপ্‌চে উঠছে, এত সার্থকতার ভার সে বইবে কেমন করে ?

সেবা আরও অনেক কথা বলেছিল। লীলা শুনে বুঝেছিল সেবার জীবন শুধু করুণ নয়, ভয়াবহ। তরুণ বয়সের সব আশা আকাঙ্খা কামনা বাসনাকে নিঃস্ব পিতার দারিদ্র্যের অগ্নিকুণ্ডে সমর্পন করে রিক্ত হয়েই যখন সে এসেছিল স্বামীর ঘরে, পাড়া পড়শী আশীর্ব্বাদ করেছিল, সিঁথির সিঁদূর বজায় থাক, ছেলে মেয়ে কোলে আসুক। যে নদীর পাড় ধ্বসে পড়ছে তার ফাটলের ওপর দাঁড়িয়ে সেই আশীর্ব্বাদ শুনে সে হেসেছিল, সে হাসি যে কত তিক্তস্বাদ তা সেই জানে। কিন্তু যখন তার স্বামীর ভাইপো আশ্রয় দিল তার মনকে, তখন অনেক সুখের স্বপ্ন সে দেখেছিল, সে স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়ে কেন, কেন তার বাপ তাকে ফিরিয়ে এনেছিল, কোন্ সুখ দেবার আশায় ? কলঙ্ক তার হতোই না হয় এমন উপোসী জীবনের চেয়ে সে যে শতগুণ ভাল ছিল। সেবা এমন কথাও বলেছিল, দেশ ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে সংসার পাততাম, ছেলে পেতাম, মেয়ে পেতাম, অতবড় সুখের পাহাড়ের তলায় কলঙ্ক যদি তার চাপা না-ই পড়তো তার জন্যে সে আক্ষেপ করতো না, কলঙ্কিত হয়েই জীবন তার সার্থক হত, একি মিথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি ভাই, এ জীবনতো আর বইতে পারছিনে।

শুনতে শুনতে লীলার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

সে দিন সন্ধ্যেবেলা সবার জল ধরা হয়ে গেলে লীলা জল ধরতে এসেছিল। হঠাৎ অস্পষ্ট আলোয় লীলার মনে হয় পাশে যেন কার ছায়া পড়েছে। সে চম্‌কে উঠে মুখ তুলে দেখে পাশের ঘরের বউটির স্বামী আধ অন্ধকারে তার পথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত্তে লীলা বুঝে নিল এখন ভয় পেলে তার চলবে না তাই জলের বালতি রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, চাপা দৃঢ়স্বরে বললো, 'পথ ছাড়ুন, নইলে আমি চেঁচাব।' লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছে বলে মনে হল না বরং সে আরও এক পা এগিয়ে এল। লীলা এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো 'পথ ছাড়ুন বল্‌ছি।'

সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঘরে কাজের ব্যস্ততা, খিদে পাওয়া ঘুম পাওয়া ছেলে পিলে শিশুদের কান্নার শোরগোল, মায়েদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, তারা চোখে কানে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছেনা। এ সময়ে তাকে বাঁচাবার কেউ নেই আকস্মিকভাবে একথা লীলার মনে খেলে যেতেই তার হিমশীতল দেহ এক অদ্ভুত উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেল, এক মুহূর্ত্তে জলভরা বালতির জল ঢেলে দিয়ে দুই হাতে বালতিটা দৃঢ় করে ধরে সে সোজা হয়ে দাঁড়লো, তাই দেখে লোকটি দু'পা পেছিয়ে গেল। এই সময়ে কর্ম্মহীন রোগশয্যাতলে যে বউটি রাত্রিদিন শুয়ে থাকে সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'লজ্জা সরম কি এক ফোঁটাও তোমার শরীরে নেই গো, ঘরে এসো. বল্‌ছি, বেহায়া কোথাকার।'

ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে লীলা একেবারে বিছানার উপরে লুটিয়ে পড়লো, বুকের স্পন্দনে তার কথা বলবার শক্তি ছিল না। নারায়ণী শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

দিন দুই পরে একদিন সকাল বেলা লীলাকে কলতলায় দেখতে পেয়ে তাকে জানালার কাছে ডেকে রুগ্ন বউটি বললো, 'তুমি আর সন্ধ্যেবেলায় জল নিতে এসো না ভাই, এই সব পচা-নর্দ্দামা খেকো ঘেয়ো কুকুরগুলোকে বিশ্বেস নেই, খ্যাঁক করে কখন দাঁত বসিয়ে দেয় তার ঠিক নেই।'

যেটুকু পড়াশোনার বিদ্যা লীলার ছিল কোন রকম চাকুরীর পক্ষেই তা পর্য্যাপ্ত নয় তা বুঝতে পেরে লীলা আরও একটু পড়া শোনা করবার চেষ্টায় ছিল। বিকাল বেলা নিবিষ্ট চিত্তে সে কি একখানা বই পড়ছিল দ্বারপ্রান্ত থেকে আওয়াজ এল, 'লীলাদি।' লীলা মুখ তুলে ডাকলো, 'এসো মানিক।' ঘরে ঢুকলো সেবার ভাই মানিক, কিশোর বয়স, চঞ্চল দুটি উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দুঃখ দারিদ্র্যকে পরাভূত করে যেন কোন্ আনন্দ-লোকে বিচরণ করছে। লীলা বললো, 'আজকে তোমার ইস্কুলের নতুন খবর কি বলতো মানিক ভাই? তোমার বন্ধু কমলেশ—' মানিক বলে উঠলো, 'লীলা দি, আবার! একশোবার তোমায় বলেছি যে ও আমার বন্ধু নয়, তবু তুমি রোজ রোজ ওই কথাই বলবে?'

লীলা হেসে ফেললো। ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদের কথা, বন্ধু বান্ধবদের কথা, খেলা ধুলো মারামারি দলাদলির কথা দিনের পর দিন মানিকের মুখে শুনে শুনে লীলার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

হাসতে হাসতে সে বললো, 'তাই তো। কিন্তু কি অপরাধ যে বেচারীর তা' বুঝতেই পারি না, এক ক্লাসে পড়ো বন্ধুই বা নয় কেন? না হয় সে একটু মারামারি গালাগালি করতে ভালবাসে, পড়াশোনায় না হয় একটু মন কম, জমকালো পোষাক পরে ইস্কুলে আসবার সখ আছে, মিথ্যে কথা দুটো চারটে না হয় বলেই—'

'উঃ লীলাদি, কি ঠাট্টাই যে তুমি করতে পারো। 'ওকে আমরা ফার্স্ট ক্লাসের সব ছেলে মিলে বয়কট্ করেছি জানো?'

লীলা করুণস্বরে বললো, 'বেচারীর জন্যে সত্যি আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।'

'তা' হোক্‌গে। আচ্ছা লীলাদি, বলতো তোমার জন্যে কি এনেছি?'

'কী এনেছ? সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে হীরেমন তোতা বোধ হয়।'

'আমি কি রূপকথার রাজপুত্তুর যে হীরেমন তোতা আনবো?'

লীলা বললো, 'তবে?'

মানিক বলে, 'আচ্ছা একবারটি হাঁ করনা লীলাদি।'

লীলা বললো, 'হ্যাঁ, আমি হাঁ করি আর তুমি আমার মুখে আরশুলা পুরে দাও কেমন?'

বিরক্ত হয়ে মানিক বলে, 'কি যে তুমি বাজে বকো লীলাদি, সত্যি একবারটি হাঁ করনা লক্ষিটি।'

লীলা ওর হাত চেপে ধরলো, বললো, 'দেখি কি এনেছো ?' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মানিক সরে দাঁড়ায়, তার পরেই জোর করে লীলার মুখে একটা টফি গুঁজে দিয়ে ও ছুটে পালায়, হাত বাড়িয়ে লীলা তাকে ধরতে যায়, পারে না। সে বুঝতে পারে স্কুলে টিফিন না খেয়ে সেই পয়সা থেকে ও টফি কিনে এনেছে। একটা সুন্দর কিশোর মনের স্পর্শ তাকে অভিভূত করে।

সেবা একটা প্রসাধনী দ্রব্য তৈরীর কারখানায় শিশি বোতলে লেবেল লাগানোর কাজ পেয়েছিল। তাদের অভাবের সংসারে যদিও তা' এমন কিছু নয় তবু তো কিছুটা সাহায্য হয়। আরও অনেক মেয়ে সেখানে কাজ করে, এক তলায় একটা বিস্তৃত ঘরে মেয়েদের কাজ, ছক বাঁধা রুটিন্, দশটা ছয়টা খাটতে হয়। লীলাকে একদিন সে বল্লো, 'তুমিও তো ভাই কাজ খুঁজছো, এই কাজই কর না, তোমরা তো মাত্র দু'টি লোক, তোমার এতে পোষাবে।'

লীলা কিছুই জানতো না, সেবার কাছে সব শুনে তার সঙ্গে গিয়ে কারখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করলো।

প্রোপ্রাইটর অপরেশ দত্ত রায়ের অফিস ঘরের সামনে লীলাকে পৌঁছে দিয়ে সেবা কাজে গেল। অফিস বেয়ারার হাতে লীলার নামের চিরকুট পেয়ে দত্ত সাহেব তাকে ভেতরে আসতে অনুমতি দিলেন। লীলার আপাদ মস্তক হালকা ভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি মেয়েদের ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতে চান ?'

লীলা নতমুখে বললো, 'হ্যাঁ।'

'এখানে কি কাজ করতে হবে তা' আপনি জানেন ?'

লীলা উত্তর দিল, 'না।'

অপরেশ দত্তরায় বললেন, 'অবশ্য ওই মেয়েরা যে কাজ করে তা' খুবই সহজ তবে আমার এখানে ওর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজও আছে। এখানে আমার নিজের কারখানাতেই প্রসাধনের সব জিনিসপত্র তৈরী হয়, প্যাক্ করে নানা দেশে পাঠানো হয়, হিসেব পত্র সংক্রান্ত কাজ, আরও অনেক রকমের কাজ আছে। আপাততঃ আপনি মেয়েদের ওখানেই কাজ আরম্ভ করুন, আমি পরে বুঝে দেখব।'

লীলা নমস্কার করে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

অপরেশ দত্তরায়ের বয়স সম্ভবতঃ পঞ্চাশের কাছে। পৌরুষ-ব্যঞ্জক সুশ্রী চেহারা, পরিচ্ছন্ন নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মার্জ্জিত কথাবার্ত্তা তাঁর আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। অফিসে তিনি দত্তসাহেব নামেই পরিচিত, তাঁর পুরোনাম কর্ম্মীরা অনেকেই হয়তো জানেনা। তাঁর কথাবার্ত্তার সুর লীলাকে আশ্বাস দিল।

মেয়েদের ঘরে কুমারী, বিধবা এবং বিবাহিতা সব রকমের মেয়েই আছে, বিবাহিতা মেয়ের সংখ্যাই বেশী। স্বামীদের স্বল্প আয়ে সংসার চলা কঠিন তাই বাড়তি কিছু আয়ের এই পন্থা তারা আবিষ্কার করেছে। দরিদ্র সংসারের অজস্র কাজ আর ছেলেপিলের ভার শাশুড়ী ননদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যে

মেয়েরা পয়সা রোজগারের জন্যে বেরিয়েছে বাড়ী ফেরার আগে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লেবেল লাগানোর কাজ শেষ করবার জন্যে তারা ব্যস্ত। খোশগল্প করে সময় কাটানোর উপায় তাদের যদিও নেই তবু এর মধ্যেই ঘরোয়া সুখ দুঃখের গল্প, শাশুড়ী ননদের নিন্দে, পাড়াপড়শীর কেলেঙ্কারীর কাহিনী কিছুই বাদ যায় না। সেবাও এ সবে যোগ না দেয় তা' নয়, বিশেষ করে তরুণীদের রস আলোচনায় তার আগ্রহ খুব বেশী। লীলা নিঃশব্দে কাজ করে যায়। তার পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর এই পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে আসে, ওই সব কুৎসিত আলোচনা অসহ্য মনে হয়। এক একবার তার মনে হয় ঘর ছেড়ে সে বাইরে চলে যায়, নির্ম্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচে, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আয়ের এই পন্থাটুকুকে সে অবলম্বন করেছে, একে ছাড়বার তার উপায় কই।

এরই দিনকয়েক পরে প্রোপ্রাইটর একদিন মেয়েদের কাজ দেখতে এলেন। ঘরে তিনি ঢোকেন না, দরজার কাছে তাঁর কাশির শব্দ শুনে মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয়ে হাসি গুঞ্জন থামায়, কাপড় চোপড় সংযত করে। এক ইঞ্চি পর্দ্দা সরিয়ে তিনি বলে যান, 'মায়েরা একটু মন দিয়ে কাজ করবেন, আমাদের কাজ খুব বেড়ে যাচ্ছে, অর্ডার খুব আসছে, আপনাদের ওপর কাজের চাপ আরও পড়বে ; অবশ্য আর্থিক দিক দিয়েও আপনাদের সুবিধে হবে।' এইটুকু বলেই পর্দ্দা ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে যান।

লীলা মাথা নীচু করে কাজ করছিল। দত্তসাহেবের ভারি

জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে সেবা তাকে একটু আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বলে, 'বাব্বা, কি কাজের মেয়ে, মুখ গুঁজে যে সেই থেকে বসেছে আর রামবিষ্টু নেই। যে ভদ্রলোকের কাছে কাজ করছিস্ তার চেহারা খানাও তো একটু চিনে রাখতে হয়।' লীলা উত্তর দেয় না, নিঃশব্দে ক্ষিপ্রহাতে নিজের কাজ করে যায়। একদিন সেবা তাকে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়ে বলে দত্তসাহেব নাকি তার হাতদুখানার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন। উত্তপ্ত ঘৃণায় তীব্র কণ্ঠে সে বলে ওঠে, 'ছিঃ সেবাদি।' তার পর কষ্টে চোখের জল সংবরণ করে।

লীলার কাজের নিষ্ঠা দেখে অপরেশ দত্তরায় মুগ্ধ হন। কিছুদিন পর একদিন তিনি দরজার বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললেন, 'কুমারী লীলা মৈত্র, দয়া করে আপনি কি একটু উঠে আসবেন?'

হাতের কাজ রেখে দরজার পাশে এসে মাথা নীচু করে লীলা দাঁড়ায়। দত্তসাহেব বলেন, 'আপনার কাজ কিছুদিন থেকেই আমি লক্ষ করছি, আমার মনে হয় একাজ আপনি অত্যন্ত অনায়াসে করতে পারছেন। এর চেয়ে আর একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনাকে নিয়োগ করে আমি দেখতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে বেলা দুটোর সময় আমার অফিস রুমে একবার দেখা করবেন, আমার বেয়ারা এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।' এইটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন।

মেয়েরা অনেকেই এ অপ্রত্যাশিত পক্ষ-পাতিত্বে ঈর্ষাকাতর

চোখে লীলার দিকে চাইতে লাগলো। এম্‌নিতেই লীলার ওপর তারা খুশী নয়, সে তাদের কোন রকমের আলোচনায় বিন্দুমাত্র যোগ দেয় না, নিঃশব্দে মুখ বুজে কাজ করে যায়, একে তারা অহঙ্কার বলেই ধরে নিয়েছে। আড়ালে টিপ্পনি কাটে,—অত যদি বড় ঘরের অহঙ্কার, তবে আবার এ সব ছোট কাজে আসা কেন?

সেবার কানে গেলে সে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে, 'সবাই কি একরকম হয়, তোমরা ওর কি দোষটা দেখলে?'

বেলা দুটোর সময় দত্তসাহেবের বেয়ারা লীলার নাম লেখা একখানা চিরকুট এনে লীলার হাতে দিল, লীলা উঠে গেল। সে চৌকাঠের বাইরে পা দিতেই এদিকে বিরুদ্ধ আলোচনার স্রোত বইতে লাগলো, 'এত টান কিসের গো, এত মেয়ে আছে ওর মত গুণী আর কেউ নেই নাকি? কি চোখেই দেখেছে দত্তসাহেব ওকে, তবু যদি রূপসী হতো।'

একজন বাঁকা করে জবাব দিল, 'রূপ কি আবার দেহে থাকে, রূপ থাকে পুরুষের চোখে।'

সেবা ক্রুদ্ধ হয়েই বললো, 'গুণও থাকে পুরুষের চোখে গো, তারা গুণী দেখলেই চিনতে পারে।'

একটি মেয়ে বললো, 'ওর জন্যে তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন ভাই, তুমি বুঝি ওর বন্ধু?'

সেবা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, 'ওর জন্যে তোমাদেরই বা এত গায়ের জ্বালা কেন ভাই, ও তোমাদের কোন শত্রুতা

করেছে ?' সেবার সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারেনা, একজন মধ্যস্থ হয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়।

বেয়ারা লীলাকে দত্তসাহেবের অফিস ঘরে পৌঁছে দিলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজ পত্র দেখতে দেখতেই তিনি বললেন, 'বসুন।' আবার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে তিনি খস্ খস্ করে লিখে চললেন।

মালিকের সামনে চেয়ারে বসাটা রীতিবিরুদ্ধ, ইতস্ততঃ করে তাই লীলা দাঁড়িয়েই রইলো। এবার মাথা তুলে তার দিকে চেয়ে একটু দূরের একখানা চেয়ারের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে আর একবার দত্তসাহেব বললেন, 'ওই চেয়ারটায় বসুন।'

লীলা আসন গ্রহণ করলে দত্তসাহেব বললেন, 'আপনার কাজের শৃঙ্খলা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে দিয়ে আমরা আরও বেশী কাজ পাব, ওইরকম একটা হাল্কা কাজে আপনাকে নিযুক্ত রাখলে আপনার ক্ষমতার অপচয় হবে বলেই মনে করি। আচ্ছা, আপনাকে আমি ক্যান্‌ভাসিংএ যদি পাঠাই আপনার আপত্তি আছে কি ? মেয়েদের জিনিসে মেয়ে ক্যান্-ভাসার হলেই আমাদের সুবিধে, মেয়েরা যেমন করে বোঝাতে পারবেন, অন্তঃপুরে যেতে পারবেন ছেলেদের দ্বারা তা' হওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে গাড়ী দেব, সঙ্গে লোক দেব, কল্‌কাতার বাইরে—'

লীলা মৃদুকণ্ঠে বললো, 'আমার মাকে একলা রেখে বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'আই সী—আমার ভুল হয়েছে, আপনার সম্বন্ধে কিছুই আমার জানা হয়নি। বাড়ীতে আপনার মা আছেন, আর ?'

লীলা বললো, 'আর কেউ নেই।'

অপরেশ দত্তরায় একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তা করে বললেন, 'দেখুন, আমাদের কারখানার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাকে দি'। আমাদের এই যে বড় বাড়ীটা দেখছেন এর মধ্যে নানা ডিপার্টমেণ্ট আছে। যে সব জিনিস এখানে তৈরী হয় বাংলা দেশের বাইরেও তার সুনাম হয়েছে। এ সব তৈরী করছেন কেমিষ্টরা, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এসব জিনিস তৈরী হয়, যন্ত্রের সাহায্যে শিশি বোতলে ভর্ত্তি করা হয়। প্রসাধন দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করবার জন্যেও একটা দল আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন মেয়ে কেমিষ্টও আছেন। এসব জিনিস মেয়েরাই ভালো বোঝেন। কোন গন্ধটা মিষ্টি, কোন্‌টা তীব্র, কোন জিনিস কতটা পরিমাণে মেশালে ঠিক সামঞ্জস্য হবে এ সব সাধারণতঃ মেয়েদের পরামর্শেই চলে। কেমিষ্ট্রির ছাত্ররা কেবল ফরমুলা অনুসারে জিনিস গুলো মেশান, ফাইন্যাল চয়েস্‌ মেয়েদের সমর্থনের অপেক্ষায় থাকে। আপনাকে ঐ মেয়েদের সঙ্গে যদি কাজ করতে বলি—'

লীলা বাধা দিয়ে বললো, 'প্রসাধনের জিনিস সম্বন্ধে সত্যি আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, আমি কোন্‌টা ভালো কোনটা খারাপ তা' বুঝতেই পারবো না, আর তা' ছাড়া লেখাপড়াও আমি বিশেষ কিছু জানিনে।'

দত্তরায় এতক্ষণ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই আলোচনা করছিলেন, এবার হেসে উঠলেন। বললেন, 'সেণ্ট, তেল, ক্রীম, স্নো, পাউডার এ সব জিনিসের সম্বন্ধে আপনার অজ্ঞতার কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, কারণ মেয়েদেরই এ সব জিনিসে ইণ্টারেষ্ট বেশী। যাই হোক্, আমি ভেবে দেখি আপনাকে অন্য কোন রকম কাজ দেওয়া সম্ভব কিনা। বেয়ারা !'

বাইরে থেকে বেয়ারা এসে সেলাম দিল। দত্ত সাহেব বললেন, 'এঁকে এঁর ঘরে পৌঁছে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েরা কৌতূহলে ফেটে পড়ছিল, কিন্তু লীলার কঠিন গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় নি। লীলা নিঃশব্দে আবার নিজের কাজে যোগ দিল।

এর কয়েক দিন পরেই আবার দত্ত সাহেবের বেয়ারা এসে কুমারী মৈত্রকে সেলাম দিল। তার হাতে দত্ত সাহেবের আহ্বান পেয়ে লীলাকে যেতে হল। মেয়েরা চোখ টেপাটিপি করছিল, সেবার ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু অবাক্ হয়ে তারা লক্ষ করছিল এই বারে বারে ডেকে পাঠানোটা যেন সেবার কাছে খুব প্রীতিকর হয়নি। তার অপ্রসন্ন মুখ দেখে চতুর মেয়েরা সেটা ধরে নিয়েছিল কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায়নি, কি জানি হাওয়া কোন দিকে বইছে, ঝড় ওঠে যদি।

বেলা তখন তিনটে। লীলা এসে দাঁড়াতেই দত্ত সাহেব তাকে বসতে বললেন। লীলা আসন গ্রহণ করলে তিনি

বেয়ারাকে ডেকে তুজনের চা আর তার আনুষঙ্গিক কিছু আনতে হুকুম দিলেন, তারপর বললেন, 'আসুন মিস্ মৈত্র, টিফিনটা সেরে নেওয়া যাক্, তারপর আমরা কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করব।'

লীলা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললো, 'চা আমি খাইনে, শুধু শুধু আমার জন্যে—'

'ও,' বলে দত্ত সাহেব তৎক্ষণাৎ কলিং বেলে হাত দিলেন, বেয়ারা ফিরে এলে বললেন, 'তু কাপ চায়ের দরকার নেই, এক কাপ চা আনবে আর এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ। কি বলেন মিস্ মৈত্র, গরমের দিনে ওটা আমার বিশেষ প্রিয় পানীয় তাই আমি সবাইকেই ওটা অফার করি, যদিও গরম ঠাণ্ডা কিছুতেই আমার অরুচি নেই।' এই বলে তিনি হেসে উঠলেন, লীলা মাথা নীচু করে বসে রইলো।

কোথায় যেন কি একটা বাধছে তা' লীলা ঠিক ধরে উঠতে পারছে না। অধীনস্থ সামান্য কর্ম্মীর সঙ্গে উচ্চমর্য্যাদাসম্পন্ন এই ভদ্রলোকের ব্যবহার যেন কতকটা সঙ্গত সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে এই রকম একটা সন্দেহ তার মনকে পীড়িত করছিল, কিন্তু কি বলবে তা' সে জানে না, বারে বারে আপত্তি করাটা শোভন কিনা এটাও ঠিক সে বুঝে উঠতে পারছে না, আর তা' ছাড়া মেয়েদের সম্বন্ধে সৌজন্যমূলক ব্যবহার এই রকম কিনা সে সম্বন্ধেও তার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সে নিঃশব্দে বসে রইলো।

অফিস রুমের পাশে কাঠের পার্টিশান করা ছোট একখানা ঘর। সেখানে নিয়ে লীলাকে বসিয়ে দত্ত সাহেব টিফিন খেলেন, লীলাও মাথা নীচু করে খাদ্য একটু নাড়াচাড়া করলো। তারপর দুজনে উঠে এসে আবার অফিস রুমে বসলেন। দত্ত সাহেব বললেন, 'তা হলে এবার কাজের কথা হোক্। আপনাকে আমি কিছু কিছু লেখা পড়ার কাজ দিতে চাই। মনে করুন অল্প স্বল্প হিসেব পত্র রাখা, মেয়েদের ডিপার্টমেণ্টে কতটা কাজ হচ্ছে, কি রকম প্রগ্রেস্ হচ্ছে, এইসব একটু দেখাশোনা করে তার রিপোর্ট লেখা, আমার দিক থেকেই এ কাজটা আপনাকে করতে বলছি।'

লীলা একটু শঙ্কিত হয়ে বললো, 'এ কাজ কি আমি পারবো?'

দত্তরায় উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কেন পারবেন না? চেষ্টা করে দেখুন না। আর যদি কোন অসুবিধে বোধ করেন আমার কাছে এসে বুঝে নিয়ে যাবেন। আমার এই পাশের ঘরটাই আপনার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করেছি, এখানে কেউ আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না।'

লীলার কাজে প্রমোশন হল।

কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরীর মেয়েরা তাকে ভালবাসে কিন্তু যে ঘরে লেবেল্ লাগানো হয় সেই ঘরের পরিচিতা মেয়েরা তার সঙ্গে ঠিক সহযোগিতা করতে চায় না, ঠিক ঠিক তথ্য সংগ্রহ করা লীলার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। সেবার কথাবার্ত্তায়

মধ্যেও যেন সে হৃদ্যতার সুর বজায় নেই, কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব, কাটা কাটা কথা, লীলা একটু মুস্কিলেই পড়লো।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে মানিকের অনেক দেরি দেখে সেবা উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে মানিক বাড়ীতে ঢুকেই একেবারে লীলার ঘরে এসে উপস্থিত হল, বলে উঠ্‌লো, 'লীলাদি, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।'

লীলা কাছে এসে বললো, 'কি কাণ্ড মানিক, লঙ্কাকাণ্ড নাকি? কার ঘর পুড়িয়ে দিয়ে এলে কপিরাজ?'

মানিক হেসে ফেললো, বললো, 'আমি কি হনুমান?'

'নয়তো কি? তা' হনুমান হওয়াতে তোমার আপত্তিটা কি, আমি তো জানি সপ্তকাণ্ড রামায়ণে হনুমানই সবচেয়ে বড় বীর, তার জন্যেই তো সীতা উদ্ধার হল।'

মানিক বললো, 'তুমি তাহ'লে সীতা।'

'না মানিক, আমি সীতা হতে পারবো না, কলকাতায় বাল্মিকীর তপোবন নেই যে একটু ঘুরে বেড়াবো।'

মানিক খিল খিল করে হেসে উঠলো, 'কেন, ইডেন গার্ডেন তোমার তপোবন হবে। আচ্ছা যাক্‌গে, আমার আসল কথাটা তো শুনছই না। আজকে আমরা মস্তবড় প্রোসেশন করে ময়দানে মিটিংএ গিয়েছিলাম জানো? আমাদের দলের হাতে কাস্তে হাতুড়ির ফ্ল্যাগ ছিল, লাল ঝাণ্ডাকি জয়, বলে শ্লোগান দিয়ে খুব চেঁচালাম।'

লীলা সবিস্ময়ে বললো, 'ছি মানিক, হুজুগে মেতে শুধু শুধু পড়া কামাই করলে ?'

চোখ বড় বড় করে মানিক বললো, 'শুধু, শুধু !' লীলা গম্ভীর মুখে বললো, 'নয়তো কি ? মাষ্টার মশাইরা কি তোমাদের দল বেঁধে মিটিংএ যাবার জন্যে ছুটি দিয়েছিলেন ?'

মানিক বললো, 'না তো। বেলা দু'টোর সময় আমরা সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলাম, আমাদের আগে থাকতেই কথা ছিল। মাষ্টার মশাইরা স্কুলের ছুটির সময় অবধি স্কুলে রইলেন, তাঁরা তো আর ডিসিপ্লিন ভাঙ্গতে পারেন না।'

লীলা একটু হেসে বললো, 'আর তোমাদের বুঝি ডিসিপ্লিন মানতে নেই ? শোননি অধ্যয়নই ছাত্রের তপস্যা ? আমি বড় দুঃখিত হয়েছি মানিক।'

একমুহূর্ত্তে মানিক যেন নিভে গেল। মুখ মলিন করে সে বললো, 'তুমি যা'তে দুঃখ পাও আমি আর কোন দিন তা' করবো না লীলাদি।'

আস্তে আস্তে মানিকের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে লীলা বললো, 'না, করবে না। বড় হয়ে অনেক পড়াশোনা করে যা' ভাল বুঝবে কোরো, এখন নয়।' তারপর জোর দিয়ে বললো, 'হাতমুখ ধোও গে দুষ্টু ছেলে, খিদে পায়নি বুঝি ?'

মানিক মেধাবী ছেলে। সে বরাবর ক্লাসে প্রথম হয়ে উঠছে দেখে মাষ্টার মশাইরা তাকে ফ্রি করে নিয়েছিলেন। তাতে সেবার ভার একটু লাঘব হয়েছিল বটে কিন্তু স্কুলের বই আর

জামা কাপড় যোগাতেই তার প্রাণান্ত হচ্ছিল। মা বাবা দিদির মনে সে অনেক আশার আলো জ্বালিয়েছিল, মানিক বড় হয়ে মানুষ হবে, সংসারে সুখ সচ্ছলতা আনবে। ভবিষ্যতের সে এক উজ্জ্বল স্বপ্ন, তার জন্যে সমস্ত পরিবার কৃচ্ছ্রসাধন করছে।

লীলা ভাবে, দারিদ্র্যপীড়িত এক বৃহৎ পরিবার নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে পড়াশোনা করে চাকরি করে মানিক পয়সা আনবে, দুঃখের রাত্রি তাদের অবসান হবে, কিন্তু মানিক কি তা বোঝে ? ভাবজগতের সঙ্গে বাস্তবের যে বিরোধ ওর সৌন্দর্য্যপিপাসু কিশোর মন তা' ধারণা করতে পারে না। লীলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

দত্ত সাহেবের অফিস রুমের পাশে কাঠের পার্টিশান দেওয়া ঘরখানাই লীলার কাজের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। দরজার আড়ালে লীলা একান্ত ভাবে যখন নিজের কাজে মগ্ন থাকতো পাশে অফিস ঘরে দত্তসাহেবের অস্তিত্ব তখন সে ভুলে যেতো কিন্তু মাঝে মাঝে কলিংবেলের শব্দ আর কোন কর্ম্মীর আসা যাওয়া কথাবার্ত্তার আওয়াজ কানে এলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে উন্মনা হয়ে যেত সে।

সেদিন বিকেল বেলা গাণিতিক কি একটা গরমিলকে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে না পেরে লীলা যখন গলদ্ঘর্ম্ম হচ্ছিল, দত্ত সাহেব দরজার কাছ থেকে বললেন, 'মিস্ মৈত্র, ঘরে আসতে পারি কি ?'

লীলা ত্রস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বললো, 'আসুন।'

দত্ত সাহেব স্প্রিংএর কাটা দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন তারপর ঘরের এককোনে তাঁর চেয়ারটায় খাড়া ভাবে বসে লীলাকে বললেন, 'বসুন।'

লীলা তার চেয়ারে বসলো। দত্ত সাহেব একমুহূর্ত্ত লীলার টেবিলে ছড়ানো খাতা পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এবারে আপনাকে একটু দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছি, আশা করি কাজটা আপনার পক্ষে খুব কঠিন মনে হচ্চে না, তবে বলেছি তো দরকার বোধ করলে আমাকে দেখিয়ে নেবেন।'

লীলা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললো, 'তা' হলে এটাই একটু দেখে দিলে—'

'সানন্দে।' বলে দত্ত সাহেব দুইহাতে তাঁর চেয়ারখানা শূন্যে তুলে লীলার চেয়ারের পাশে রাখলেন, বসে পড়ে বললেন, 'এখন বলুন দেখি কোনটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

দত্তসাহেব পাশে এসে বসতেই লীলা সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে চেয়ার ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াতেই দত্ত সাহেব বলে উঠলেন, 'বাঃ, কাকে বুঝিয়ে দেব কাজ, চেয়ার টেবিলকে? বসুন, বসুন, পাশে না বসলে কি করে কাজ বুঝে নেবেন?'

যুক্তিকে মানতে হ'লো, লীলা বাধ্য হয়েই বসলো। এই সময়ে তাঁর কারখানার একটি ছেলে কোন দরকারে এসে, অফিস রুমে দত্ত সাহেবকে দেখতে না পেয়ে স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলে ঘরে

ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দত্ত সাহেব বললেন, 'এসো, এসো সুরেশ্বর, আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম ওঁকে একটু কাজ বুঝিয়ে দিতে, আচ্ছা তুমি কি বলতে এসেছ বল, এসো।' বলেই তিনি অফিসে এসে বসলেন।

ছেলেটি চলে গেলে দত্ত সাহেব আবার এসে তাঁর চেয়ারখানা তুলে নিয়ে যথাস্থানে সরে বসলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনি তো বোধহয় এই মার্চ্চে চার মাস হল এখানে কাজ করছেন, অবশ্য এ কাজে আপনি মাস দুই হল এসেছেন। তা' এখানকার কাজ আপনার ভাল লাগ্‌ছে ?'

লীলা মুখ নীচু করে রইলো।

দত্ত সাহেব আবার নিজেই বললেন, 'দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলব ভেবেছি। এখানে আপনাকে কাজ করবার জন্যে আপনার নিজস্ব একখানা ঘর দিতে পারিনি, আমার ঘরের একটা ছোট্ট অংশ আপনাকে দিতে হয়েছে, মাঝে মাঝে আমার কাছে লোকজন এসে আপনার কাজের অসুবিধে ঘটায়। তাই ভেবেছি, উড্ ষ্ট্রীটে আমার নিজের বাড়ীতে অনেক ঘর পড়ে রয়েছে, তারই একখানাতে আপনি কাজ কর্ম্ম করতে পারেন, আর আমার গাড়ী রয়েছে, ড্রাইভারকে হুকুম করলেই যথাসময়ে আপনাকে নিয়ে আসবে, তারপর ছুটি হয়ে গেলে সেই গাড়ীতেই আপনাকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেবে, কি বলেন ?'

মুখ নীচু করেই লীলা বললো, 'তাতে আমার কিছু সুবিধে হবে না, আমি এখান থেকেই কাজ সেরে বাড়ীতে ফিরতে চাই।'

অপরেশ দত্তরায় বুদ্ধিমান, এরপর আর কোন কথা বলা উচিত নয় বুঝতে পেরে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার যা' অভিরুচি। এখানে আপনার অসুবিধের কথা ভেবেই ও কথাটা বলেছিলাম, আচ্ছা, আপনি আপনার কাজ করুন।' এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে অফিসে এসে বসলেন।

ছোট ছোট ভাইবোনদের ওপর সেবার মারপিটের মাত্রাটা কয়েক দিন হল বেড়ে গিয়েছিল। শিশুদের আর্ত্তচিৎকার সহ্য করতে না পেরে এক এক সময় লীলা দুইহাতে কান ঢেকে বইয়ে মুখগুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতো, কখনও ছুটে গিয়ে সেবার ক্রুদ্ধ আক্রোশের হাত থেকে ওদের বাঁচাবার জন্যে নিজের কাছে টেনে নিতো। সেদিনও রাগে জ্ঞানশূণ্য হয়ে সেবা ছোট একটি ভাইকে কিল চড় মেরেই চলেছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ে দুইহাতে ছেলেটিকে টেনে নিয়ে লীলা করুণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আর মেরো না, আর মেরো না সেবাদি, মরে গেল যে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সেবা সোজাহয়ে দাঁড়াল, 'মরুক, মরুক, সবকটা মরুক, হাড় জুড়োক আমার, সবাই মিলে আমায় তপ্ত তেলে ভাজছে আর জ্বালা সয় না। তোমায় তো আমি আদিখ্যেতা দেখাতে ডাকিনি ভাই, আমার ভাইবোনদের আমি মারবো তোমার তাতে কি ? আদিখ্যেতা দেখিয়ে ওদের ভোলাবার চেষ্টা, মা'র চেয়ে যে ভালবাসে তাকে বলে ডান, মারধর করি আর যাই করি খেতেও তো দেব আমিই।'

আহত হয়ে লীলা ঘরে ফিরে গেল।

এর পর একদিন লীলা কতকগুলো জামাকাপড় কিনে এনে সেবাদের ঘরে গিয়ে বললো, 'সেবাদি, পল্টু পুঁটুদের জন্যে কয়েকটা জামা কিনে এনেছি, দেখো তো ওদের গায়ে লাগে কিনা।'

সেবা বিরস মুখে বললো, 'কি দরকার ছিল এ সব কেনবার, ওরা গরীব সংসারে যে ভাবে হোক মানুষ হচ্চে বাড়াবাড়ির কোন তো দরকার নেই। তুমি বড়লোক হয়েছ তাতে আমাদের কি ?'

সেবার এই বিরূপতায় লীলা বিস্মিত, ব্যথিত হয়। কুণ্ঠিত হয়ে বলে, 'ওরা তো আমারও ভাইবোন, তুমি এগুলো নিতে আপত্তি করো না সেবাদি।'

সেবা তিক্তস্বরে বলে, 'ভিক্ষে আমরা চাইনে ভাই, খেটেখুটে যা আনতে পারছি ওতেই চলে যাচ্ছে, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও, ও আমরা নিতে পারবো না।'

একদিন সন্ধ্যেবেলা চুপি চুপি ঘরে ঢুকে মানিক ডাকলো, 'লীলাদি !'

লীলা তাকে বাঁ হাতের বেষ্টনে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'কি মানিক ভাই ?'

'আমি তোমায় একটা জিনিস দেখাব, তুমি বল কাউকে বলবে না ?'

লীলা না জেনেও কথা দিল, 'না, বলবো না।'

সন্তর্পণে চারদিকে চেয়ে শার্টের নীচে থেকে একখানা খাতা বার করে মানিক লীলার হাতে দিল, লীলা দেখলো সেখানা ওর স্কুলের রাফ্‌খাতা, বললো, 'কী আছে এতে ?'

'খুলে দেখো না।'

লীলা খুলে সবিস্ময়ে দেখলো, তার স্কুলের রাফ্‌খাতার মাঝে মাঝে কবিতা লেখা। কাঁচা হাতের অক্ষরে, এলো মেলো ছন্দে, ফুলের নয়, পাখীর নয়, নীল আকাশের চাঁদ তারারও নয়, প্রেমের কবিতা। লীলা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেল, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'পড়াশোনার সময় এই সব কর বুঝি ?'

মানিক লীলার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেলো, অনুনয় করে বললো, 'দিদিকে বলে দিওনা লীলাদি, তা হলে দিদি আমায় বড্ড বকবে।'

লীলা আশ্বাস দিল, তারপর বললো, 'কিন্তু তোমায় যে ভাল করে পরীক্ষায় পাস করতে হবে মানিক, এ সব করলে পড়াশোনা করবে কখন ?'

মানিক বললো, 'বাঃ, যারা কবি হয় তারা বুঝি বিদ্বান্‌ হয় না ?' এ প্রশ্নের লীলা উত্তর দিতে পারলো না, কারণ মানিকের কাছে অনেক বিদ্বান কবির নজীর আছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে মানিকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর তার মনে বাজ্‌তে থাকে সেবার কথা,—কত কষ্টে যে ওকে পড়াচ্ছি ভাই, সবাই মিলে না খেয়ে না প'রে, মানুষ ওকে করতে পারব কিনা জানিনে। একটাও যদি মানুষ হয় তবে কোনদিন হয়তো দুঃখু ঘুচবে, আর

সব তো ছোট ছোট। বিদ্যে নেই, সাধ্যি নেই, আমার আর ক্ষমতা কতটুকু, বল ?

একদিন মানিক বলে, 'লীলাদি, আমায় একটা জিনিস বুঝিয়ে দেবে ?'

'কী জিনিস ভাই ?'

মানিক বলে, 'কাউকে বলবে না তো তুমি ?' লীলা প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন লীলার কানের কাছে মুখ এনে মানিক ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'আচ্ছা প্রেম মানে কি লীলাদি।'

লীলা মনে মনে চমকে ওঠে। বুঝতে পারে মানিক জানে এ জিনিস মনের মর্ম্মকোষে গোপনে রাখতে হয়, তাই কানে কানে বলে।

একটু পরে তার পিঠে হাত রেখে লীলা আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, 'প্রেম মানে ভালবাসা, যেমন তুমি ফুলকে ভালবাসো, পাখীকে ভালবাসো, বাবা মা ভাইবোনদের ভালবাসো—'

বাধা দিয়ে মানিক বলে ওঠে, 'না, না, তা নয় লীলাদি, আমি আমার স্কুলের বন্ধুদের কাছে শুনেছি একটি ছেলের একটি মেয়েকে ভালোবাসার নামই হচ্ছে প্রেম।'

লীলা নির্ব্বাক হয়ে যায়। চোদ্দ বছরের ছেলের কোরক চিত্তকোষে যে মধুর সঞ্চয়ন চলেছে একদিন তা' সৌরভের ভারে আপনাকে প্রকাশ করবে, এ তারই প্রথম উন্মেষ।

সহসাই লীলার কানে গেল, 'আচ্ছা: লীলাদি, তুমি যদি আমার চেয়ে ছোট হতে—'

লীলা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'না, না, এই তো ভালো; আমি তোমার দিদি হয়েছি তুমি আমার ছোট ভাইটি।'

মানিক আবার বললো, 'কিন্তু তুমি যদি আমার চেয়ে ছোট হতে, আর আমি তোমার চেয়ে বড় হতাম আর তোমাকে আমি ভালো বাসতাম যেমন এখন বাসি—'

মানিকের মুখ চেপে ধরে চাপা আর্ত্তকণ্ঠে লীলা বলে উঠলো, 'মানিক।'

মানিক ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

'আচ্ছা মিস্ মৈত্র, একদিন আমার বাড়ীতে বেড়াতেই চলুন না, সেখানে আমার স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আসবেন।'

লীলা সচকিত স্বরে বললো, 'আপনার স্ত্রী!'

অপরেশ দত্তরায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। তিনি নেই, অনেক দিন আগে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নিজের হাতে সাজানো বাড়ী ঘর আজ দশ বছর পরেও তেমনি আছে, আমি কোন জিনিস নড়চড় করিনি। টেবিলের ফুলদানি, গ্লাসকেসের খেলনা, তাঁর নিজের হাতে বোনা ঝালরের পর্দ্দা সব তেমনি আছে শুধু তিনি নেই।'

লীলা স্তব্ধ হয়ে রইলো। এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। দত্ত সাহেব লীলাকে তাঁর মোটরে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ীতে নিজের ঘরে বসিয়ে দত্ত সাহেব

বললেন, 'আসুন মিস্ মৈত্র, আমরা কিছু খেয়ে নি, তারপর গল্প করা যাবে।'

লীলা আপত্তি করতে পারলো না।

চাকর খাবার ঘরে টেবিলে সব খাবার জিনিস সাজিয়ে দিয়ে গেল, সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম। দত্ত সাহেব চাকরকে বিদায় দিয়ে বললেন, 'আর কিছু দরকার নেই, তুমি এখন যাও। ও, এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ রেখে যাবে।'

ভৃত্য চলে গেলে দত্ত সাহেব হাসতে হাসতে বল্লেন, 'রোজই তো চাকরটা চা ঢেলে দেয় আজ লোভ হয়েছিল আপনার হাতের পরিবেশন করা চা খাই, তাই ওকে বিদায় করে দিলাম। যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তবে—'

লীলা উঠে দাঁড়িয়ে স্মিত মুখে বললো, 'বেশ তো, তাতে আর আপত্তির কি আছে? আপনি ক' চামচ চিনি খান বলুন তো?'

খাবার খেতে খেতে দত্ত সাহেব বারে বারেই বলছিলেন, 'বাঃ, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না, পানীয়টুকু খেয়ে ফেলুন, যা' গরম।'

খাবার পরে দত্ত সাহেব লীলাকে নিয়ে আবার বসবার ঘরে সোফায় এসে বসলেন। বললেন, 'আচ্ছা মিস্ মৈত্র, আপনাকে আমি দু' একটা পারিবারিক কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

নিরুৎসুক ভাবে লীলা বললো, 'বলুন।'

'আপনাদের বাড়ীতে শুধু মা আর আপনি থাকেন, না ? আপনারা কতদিন থেকে কল্‌কাতায় আছেন ?'

লীলা বললো, 'প্রায় একবছর হল।' দত্ত সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, 'তার আগে কোথায় ছিলেন ?'

লীলা উত্তর দিল, 'পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ীতে ছিলাম।'

'আই সী। আচ্ছা, দেশে আপনাদের কেউ আছেন ?'

লীলা উত্তর দিল, 'না।'

দত্ত সাহেব এবার বললেন, 'আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় নেবার আগে, নিয়মসঙ্গত ভাবে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অবশ্যই আপনাকে জানানো আমার উচিত ছিল, মাপ করবেন। আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার কিছু জানা নেই ?'

লীলা উত্তর দিল না, মুখ নত করে রইলো।

দত্ত সাহেব নিজেই বললেন, 'এই কারখানার সবাই আমাকে দত্ত সাহেব বলেই জানে, বাহিরের বন্ধুবান্ধবদের কাছেও আমি ঐ নামেই অভিহিত হই, তবে আমার ছাত্র কর্ম্মীরা আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করে থাকে। বিদেশে যাবার আগে আমি বছর দুই প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়েছিলাম সেই সূত্রে আমি ওদের মাষ্টার মশাই, যদিও এরা আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র নয় ; আমার ছাত্রেরা ওদের থেকে অনেক সিনিয়র।'

একটুখানি চুপ করে থেকে দত্ত সাহেব আবার বললেন, 'দেখুন, বিদেশে যাবার আমার কোনই কল্পনা ছিলনা, বিয়ে করে এখানেই কলেজে চাকরি নিয়ে বসেছিলাম ; কিন্তু মানুষ যা'

ভাবেনা ঘটনাচক্রে তাই ঘটে যায়, বিয়ের কয়েক বছর পরে আমার স্ত্রী মারা গেলেন। এই দেখুন তাঁর ছবি।'

দত্ত সাহেব হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সোনালী ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি নিয়ে লীলার হাতে দিলেন। লীলা দেখলো, অপূর্ব্ব সুন্দর মেয়েটির মুখশ্রী, হাসিময় চোখ দুটি তার যেন ভাষাময়। লীলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

দত্ত রায় বললেন, 'আমার স্ত্রী শুধু যে সুন্দরী ছিলেন তাই নয়, পরম গুণবতীও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এখানে, তাঁর স্মৃতিময় এ বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, তাই বিদেশে পালিয়ে গেলাম।'

দত্ত সাহেব আবার বললেন 'কেমিষ্ট্রীর একটা ভালো ডিগ্রী ছিল এখানকার, তাই ওখানে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হল। কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির ডক্টরেট নিয়ে কিছুদিন ওখানে রিসার্চ করেছিলাম, বছর পাঁচেক পরে আবার কলকাতায় ফিরে আসি ; ফিরে এসেই এই কাজে হাত দি, এই কাজই এখন আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

দত্ত সাহেবের জন্যে সমবেদনায় লীলার মন ভরে উঠেছিল। সে নিঃশব্দে শুনছিল। দত্ত সাহেব এবার একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু দেখুন মিস্ মৈত্র, সময়ে সময়ে মনে হয় জীবনটায় যেন কোন রং নেই, রস নেই, গন্ধ নেই। এক এক সময় কাজে কোন ইন্টারেষ্ট পাই না। কেন এমন হয় এর কারণ কিছু বলতে পারেন ?'

লীলা নীরব হয়েই রইলো, কোন উত্তর দিল না।

দত্ত সাহেব নিজেই আবার বললেন, 'দেখুন মিস্ মৈত্র, মানুষের মনস্তত্ত্ব এত জটিল যে মানুষ নিজেকেই নিজে চিনে উঠতে পারে না। যে স্ত্রীকে এত ভালবাসতাম, যাকে হারিয়ে জীবন মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল, তার স্মৃতি এখন আমার কাছে ফিকে হয়ে আসছে। এখন বুঝতে পারছি অতীতকে আঁকড়ে ধরে মানুষ বাঁচতে পারে না, বর্ত্তমান থেকে তার বাঁচবার উপাদান চাই।' দত্ত সাহেব এবার চুপ করলেন।

এর পরে কি প্রসঙ্গ আসতে পারে তা' ভেবে লীলা শঙ্কিত হচ্ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, মা তার জন্যে ব্যস্ত হবেন এ ভাবনাও তাকে ব্যাকুল করছিল। বাড়ী ফেরার প্রস্তাব করবার উপক্রম করতেই সহসা দত্ত সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, তারপর এগিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকের দরজাটা তিনি ভেজিয়ে দিলেন। লীলার ঠোঁট আকস্মিক ভাবে থর থর করে কেঁপে উঠলো, বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে সে উচ্চারণ করলো, 'আপনি,—আপনি—' কণ্ঠ তালু তার শুকিয়ে গিয়েছিল, আর কিছু সে বলতে পারলো না।

উপেক্ষাসূচক একটু হাসি হেসে দত্ত সাহেব বললেন, 'ভয় নেই মিস্ মৈত্র, স্থির হয়ে বসুন। আমি এমন বর্ব্বর নই যে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে আপনাকে অপমান করব। চাকররা বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করছে, তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে থেকে আপনাকে আড়াল করবার জন্যে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিলাম।

আজ দশ বছর হল আমার স্ত্রী মারা গিয়েছেন, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এ পর্য্যন্ত কোন মেয়েকে স্পর্শ করিনি। য়ুরোপে যখন ছিলাম, অনেক মেয়ে আমাকে আত্মদান করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা বনিয়াদের ওপর নয়। বসুন।'

লীলা ধপ্ করে সোফার উপরে বসে পড়লো।

দত্ত সাহেব একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আবার বললেন, 'এমন নীরস মাধুর্য্যহীন জীবন যেন আর বহন করতে পারছিনা, তাই ভেবেছিলাম আবার বিয়ে করব, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন কাউকে পাইনি যাকে ভালো লাগে। আমার গোপন দুঃখ আপনাকে জানাতে ইচ্ছে হয়েছিল, আর কেউ একথা জানে না। সবাই জানে যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ সব আমার আছে, আমি ভাগ্যবান্, কিন্তু আমি জানি আমার মত নিঃসঙ্গ দুঃখী কেউ নেই।'

দত্ত সাহেব দুই হাতের ওপর মাথা রেখে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসকে চেপে চেপে ফেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রাত হয়ে গেছে, চলুন আপনাকে রেখে আসি।'

লীলা উঠে দাঁড়ালো, গেটের সামনে এসে মৃদুস্বরে বললো, 'আপনি আর কষ্ট করবেন না, আমি একলাই যেতে পারবো।' এই কথা বলে সে রাস্তায় নেমে গেল, দত্ত সাহেব বাধা দিলেন না, নির্নিমেষ চোখে শুধু তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কারখানার তরুণ কর্ম্মীদের মধ্যে একটা চাপা আলোচনা যে না চলছিল তা নয় কিন্তু সেটা এত সূক্ষ্ম ভাবে যে তা' ধরা পড়বার কথা নয়, তবু ক্ষুরধার বুদ্ধি দত্ত সাহেব তার একটু আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন যে অঙ্কুরেই এর মূলোৎপাটন করতে হবে, না হলে তাঁর উচ্চ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে একটি নিরপরাধা কুমারীর সুনাম একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।

এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং পবিত্রতাকে সবাই এতদিন নতশিরে সম্মান দিয়ে এসেছে। তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের যে নিষ্ঠার বলে এই প্রতিষ্ঠান অবিশ্বাস্য দ্রুতভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তার মূলে হচ্ছে তাঁর প্রতি এদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, অবিচল অনুরক্তি, তাকেই অবলম্বন করে আজ তিনি বেঁচে আছেন। এ জিনিস হারালে জীবনের সে অপূরণীয় ক্ষতিকে তিনি সহ্য করতে পারবেন না, বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেলেও সে মর্য্যাদাকে তাঁর বাঁচাতে হবে।

দত্ত সাহেব সংকল্প করেছিলেন, যদি লীলা সম্মত হয় তবে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি তাকে বিবাহ করবেন। একমাত্র এই উপায়েই সব বিরুদ্ধ আলোচনার মুখ বন্ধ করা সম্ভব, আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয় তাহলে আলোচনা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

বস্তির মধ্যে দত্ত সাহেব আর লীলাকে জড়িয়ে যে শ্লেষাত্মক আলোচনা হয় তা' লীলার কানে আসে। বস্তিবাসিনীদের সবিস্ময় দৃষ্টি ও সকৌতুক প্রশ্ন তাকে বিব্রত করে কিন্তু সে জানে এ মিথ্যেকে কোন কিছু দিয়েই মিথ্যে প্রমাণ করা যাবে না, তাই সে চুপ করে থাকে, তবু মন ক্লান্ত হয়। সেবার রূঢ় ব্যবহারই তাকে বড় বাজে। সকাল বেলা কাজে যাবার আগে সেবার সংসারের কাজের বড় ভিড়, লীলা তাকে কোন কোন দিকে সাহায্য করে থাকে। আজকাল লীলা কোন কাজে হাত দিতে গেলে সেবা বলে ওঠে, 'থাক্ থাক্, সোনার হাতে যবের ছাতু, তোমার আর এ সব কেন ভাই ?' সবাই তার ওপর বিরূপ কেবল সেই রোগাক্রান্তা বউটি তাকে জানালার একান্তে ডেকে সান্ত্বনা দেয়, 'আমি জানি ভাই, এ সব মিথ্যে কথা, যাদের ছোটমন তারা তোমার মত মেয়েকে সইতে পারে না তাই ও সব রটায়, তুমি মন খারাপ করোনা ভাই।'

কেমন করে এ কথা সেবার কানে ওঠে, সে লীলাকে সামনে পেয়ে একেবারে ফেটে পড়ে, 'কত আর ন্যাকামি দেখাবে গো, মেনীমুখো লোকেদের কারু চিনতে জোয়ায় না। বড়লোকের নজরে পড়ে দেমাকে যে মাটিতে পা পড়ছে না তাকি দেখতে পাইনে, আমরা কি কানা না অন্ধ ? ছোটলোক আমরা ছোট মন নিয়ে থাকি, তা বলে ঘাস খাইনে তো, মোটরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার মানে কি আমরা বুঝিনে, ডুবে ডুবে জল খেতে ওস্তাদ দেখ্‌চি।'

অচিন্তিত এই অগ্নিস্ফুরণে লীলা স্তম্ভিত হয়ে যায়, নিগূঢ় ঈর্ষার কুৎসিত রূপ তাকে বিহ্বল করে। জীবনের সমুদ্রমন্থনে ভাগ্যের বঞ্চনার যে হলাহল সেবার দেহ মনকে জর্জ্জরিত করে তার জিহ্বাগ্রে সঞ্চিত হয়ে ছিল তারই সবটুকু গরল সে লীলার উপর ঢেলে দেয়। সেবা থামতে পারে না, বলতেই থাকে, কুৎসিত কদর্য্য অশ্লীল যত কিছু মুখে আসে; যন্ত্রণায় লীলার মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হয়ে যায়, বিস্ফারিত চোখে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সে শুধু বলে ওঠে, 'ওঃ সেবাদি।' তার বিষনীল ওষ্ঠাধর আর কিছু উচ্চারণ করতে পারে না।

এরপর থেকে লীলা আর সেবার ঘরে যায়নি। কাজে অবশ্য সে যথানিয়মে গিয়েছিল কিন্তু সেখানেও সেবার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তার নির্দ্দিষ্ট ঘরে টেবিলে বসে মনঃস্থির করবার জন্যে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে সে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। সেবাকে সে ভাল বেসেছিল তাই তার দেওয়া আঘাত কঠিন হয়ে তাকে বেজেছিল, অন্য কেউ হলে তার এত লাগতো না।

নারায়ণী বুঝতে পারছিলেন এ রকম করে এখানে থাকা আর চলে না, অন্যত্র কোথায়ও সরে যেতে হবে। তিনি ভাবছিলেন তাঁর সেই দূর সম্পর্কিত আত্মীয়কেই আবার অনুরোধ করবেন অন্য কোথায়ও ঘর খুঁজে দিতে, লীলাকেও তিনি একদিন সে কথা বললেন। লীলাও সেটা বুঝতে পারছিল কিন্তু পরম বিস্ময়ে সে আবিষ্কার করলো সেবাকে ছেড়ে

যেতে মন তার অক্লেশে চায় না, তাকে ফেলে দূরে যাবার কথা ভাবতে মন তার ব্যথিত হয়।

জ্যোৎস্নাতুর গভীর রাত্রি।

লীলা জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল, ঘুম তার চোখে আসে না। বহু বিচিত্র নানা জীবনের সুখ দুঃখ তার মনকে এত দোলা দেয় যে তাকে অশান্ত করে তোলে, তার চোখের ঘুমকে হরণ করে নেয়। পাশের ঘরে মা হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন, লীলা জানলা ধরে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। নিশীথ রাত্রির নৈঃশব্দ্য তার মনের ওপর এক সূক্ষ্ম শীতলতার আস্তরণ বিছিয়ে দেয়।

দু'খানি ছোট ছোট ঘর ও একফালি বারান্দা নিয়ে প্রত্যেক ভাড়াটে থাকে। সেবাদের একখানা ঘরে তার বাপ মা ভাই বোনরা শোয় আর এক খানাতে সংসারের যাবতীয় জিনিস পত্র, রান্নার সরঞ্জাম, তারই এক কোণে বিছানা করে নিয়ে সেবা থাকে। কিছুক্ষণ আগে সেবার মায়ের যন্ত্রণার কাতরতা থেমেছে, সেবার বাপ মা ভাইবোনগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে, হয়তো সারাদিনের পরিশ্রমের পরে সেবাও গভীর ঘুমে অচেতন। লীলা ভাবে, আহা, বিশ্রাম লাভ করুক, ক্লান্ত তার দিবস, ক্লান্ত তার জীবন।

একসময় অতি সন্তর্পণে দরজা খোলার শব্দ কানে আসে, সেবার ঘরের ওদিককার দরজা খুলে যায়। সামনের স্বল্পপরিসর আঙ্গিনায় নেমে আসে যে, সে ওই রুগ্না বৌটির স্বামী।

লীলা ভয়ানক ভাবে চম্‌কে ওঠে। দুই হাতে প্রাণপণে চোখ ঢেকে সে বিছানায় আশ্রয় নেয়, সেবার উপর রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারে না। অসহায়, সমাজের ক্রীড়নক সেবা। তার কাছে তার উগ্রদেহবোধ সত্য, তার কামনা সত্য; সমাজ কঠোর হাতে তাকে দমন করতে চায় কিন্তু তার পক্ষে সেই সত্যকে সে জয় করবে কোন্ নৈতিক শক্তির জোরে? এর প্রতিবিধান কোথায়, সামঞ্জস্য কেমন করে হয় লীলা ভেবে পায় না।

দত্ত সাহেব একসময় লীলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। বলেছিলেন, 'জানি আমাদের বয়সের পার্থক্য অনেক, জানি আমি আপনার যোগ্য নই তবু ক্ষীণ আশা ছাড়তে পারিনি। আপনি যদি একে সম্ভব মনে করেন, মনে হয় তবেই জীবনে আর একবার মাধুর্য্যের আস্বাদ পাব। আর— আর একটা কথা আপনাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, আমাদের দুজনেরই সুনাম রক্ষার জন্যে এর চেয়ে ভালো পথ আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। লীলা অফিসে গিয়ে দত্ত সাহেবের কাছে তার কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিল। দত্ত সাহেব তাকে থাকবার অনুরোধ করেন নি, শুধু বলেছিলেন, 'আমাকে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই মনে রাখবেন, যদি কখনও কোন দরকার হয় আমার সাহায্য নিতে

কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না। আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।'

লীলা বিদায় নিল। সে বুঝতে পারছিল তাদের দুজনের সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্যে যে ত্যাগ তিনি স্বীকার করলেন তাঁর মনের দিক দিয়ে তাকে তুচ্ছ করা চলে না। পুরুষের দৃপ্ত মর্য্যাদাবোধের কাছে সে মনে মনে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করলো।

অচিন্তিত ভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মানিক ফেল্ করলো। তার টেবিল অনুসন্ধান করে পাঠ্য বইয়ের নীচে আবিষ্কৃত হলো সত্যেন দত্ত, নজ্রুল ইস্লাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই। সহপাঠীদের কাছ থেকে মানিক এগুলো সংগ্রহ করেছিল।

পরীক্ষার ফল যেদিন বেরুলো সেদিন তাদের সমস্ত পরিবারের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বাপ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যথাসাধ্য গালাগালি করলো, বেশী সময় তার হাতে ছিল না, সে কাজে বেরিয়ে যাবার পর আরম্ভ হল সেবার তাড়না। মানিকের গালে চড় বসিয়ে দিয়ে তীব্র কণ্ঠে সেবা চেঁচাতে লাগলো, 'তখনই আমি জানিগো, রাত দিন ওই ঘরে ফুস্ ফুস্ গুজ গুজ, ভাবতাম এতটুকু বাচ্চার সঙ্গে কি এত কথা, তখন কি বুঝতে পেরেছি যে সর্ব্ব-নাশী আমাদের সর্ব্বনাশের পথ খোলাসা করবার জন্যে কচি ছেলেটার মাথা এম্নি করে চিবিয়ে খাচ্ছে? তা' যদি জানতাম তাহলে আর তোকে ঢুকতে দিতাম

না ওর ঘরে, ঠ্যাং ভেঙ্গে দিতাম তোর হতভাগা বয়াটে বোম্বেটে কোথাকার! লজ্জার মাথা খেয়ে আবার মুখ দেখাচ্ছিস, যা' দূর হয়ে যা বাড়ী থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা।'

মাথা নীচু করে ঘরের কোণে বসে মানিক চোখের জল ফেলছিল, আর বেদনামথিত বুকে নিজের ঘরে লীলা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তার মনে হচ্ছিল হয়তো তার সত্যিই অপরাধ আছে, সে কেন মানিককে তার কাছে আসতে বাধা দেয়নি, কেন কঠিন হতে পারেনি সে।

শোকাচ্ছন্ন পরিবারে সেদিন রান্না খাওয়া কিছুই হলো না, অবুঝ শিশুগুলিকে চিঁড়ে মুড়ি দিয়ে থামানো হল, মানিককে কেউ খেতে ডাকলো না। এদিকে লীলাদের ঘরেও লীলা এতটুকু খাদ্য মুখে তুলতে পারলো না, নিঃশব্দে ভাতের থালা নিয়ে উঠে গেল।

কারখানার কাজের পরে সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে সেবা রান্না করতে গেল। সন্ধ্যে গড়িয়ে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, লীলা চুপ করে তার ঘরে বসেছিল, অস্ফুট কণ্ঠ তার কানে এল, 'লীলাদি।' ধড়মড় করে উঠে লীলা মানিককে কাছে টেনে নিল। মানিক তেমনি চুপি চুপি বললো, 'আমাকে যা খুসী বলুক দিদি তোমায় কেন অপমান করলো? তোমার তো সত্যি সত্যি কোন দোষ নেই।'

লীলা অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললো, 'আমার তাতে কিছু অপমান হয়নি, তুমি তার জন্যে দুঃখিত হয়ো না ভাইটি। এখন এসো, তোমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে তুমি কিছু খাবে।'

চুপি চুপি মানিক বলে, 'না, না, খিদে আমার একটুও পায়নি। কিন্তু তোমায় কেন দিদি অমন করে যা' তা' বলবে, কেন তোমায় সর্ব্বনাশী বলবে?—' ফুঁপিয়ে কেঁদে মানিক লীলার বুকে মুখ লুকোল।

লীলা বুঝতে পারছিল সমস্ত দিন মানিক তার জন্যে কত মনঃকষ্ট ভোগ করেছে, সে নিঃশব্দে ওর মাথাটা গভীর স্নেহে বুকের কাছে ধরে আস্তে আস্তে ওর অশ্রুসিক্ত চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

লীলার মুখের দিকে জলভরা চোখ তুলে এক সময়ে তেমনি চুপি চুপি মানিক বললো, 'লীলাদি, তোমার অপমান আর আমি সহ্য করতে পারছিনে, এ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাব আমি।' লীলা ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলো, চাপা স্বরে সে বলে উঠলো, 'না, না, না মানিক, তুমি যেতে পাবে না, কোথায়ও যেতে পাবে না তুমি।'

ক্রোধে ক্ষোভে আত্মহারা সেবা সে রাত্রে মানিককে খেতে দেয়নি কিছু, নিজেও উপবাসী ছিল। ভোর বেলা উঠে মানিককে বিছানায় দেখতে না পেয়ে ভাবলো হয়তো কোথাও গেছে, একটু পরেই ফিরবে। কিন্তু অনেকখানি বেলা হয়ে গেলেও যখন মানিক ফিরলো না তখন সেবা সারা বস্তির

ঘরে ঘরে তাকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু মানিককে পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন কেটে গেল, মানিক ফিরলো না। সমস্ত পরিবারে কান্না-কাটির রোল উঠলো কিন্তু লীলার চোখে এক ফোঁটা জল নেই, অলক্ষ্যে তার অন্তরে রক্তক্ষরণ হতে থাকলো।

অনেক দিন পরে লীলার অতসীর কথা মনে পড়লো। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে তার সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছিল, সে পরিস্থিতি হয়তো এখন আর নেই।

একদিন লীলা বিকেল বেলা অতসীদের দরজায় এসে কড়া নাড়লো, যে বেরিয়ে এল সে হিরণ, অতসী নয়। লীলা হাসিমুখে প্রশ্ন করলো, 'ভাল আছেন তো, অতসী দি কই ?'

হিরণ গম্ভীর মুখে বললো, 'সে নেই।' লীলা অভিভূতের মত আবৃত্তি করলো, 'নেই !'

হিরণ বললো, 'ঘরে এসে বসো, বলছি।' লীলা নিঃশব্দে ঘরে এসে বসলো।

হিরণ আস্তে আস্তে বললো, 'সে বাড়ী থেকে চলে গেছে, কোথায় গেছে জানি না। তোমায় সব কথা বলি তা' হলে বুঝতে পারবে। হাসপাতালে তার যমজ সন্তান হয়েছিল, একটিও বাঁচেনি, তারপর তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। সে সময় তার মাথাটাও কেমন দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল, সে সব সময় ভয় পেত। তার শরীর মনের যখন এই রকম শোচনীয় অবস্থা সেই সময় তার হাতে একখানা চিঠি এসে পড়ে, সে

আমার অফিসের সহকর্ম্মী কেতকী রায়ের চিঠি, আমাকে লিখেছিল। সন্দিগ্ধ হয়ে অতসী আমাকে প্রশ্ন করে, এ মেয়েটি কে? ও কেন তোমায় চিঠি লেখে? আমি অনেক করে ওকে বোঝালাম, ও চিঠির কোন অর্থ নেই, ও অম্নি লিখেছে, অতসী বিশ্বাস করলো না। কেতকী আমাকে ভালবাসতো, তার আবেগভরা চিঠি অতসীর মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

সেই থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হলো। অতসী সব সময় কাঁদতো আর বলতো, আমার কেউ নেই, কিছু নেই, জীবন আমার মিথ্যে হয়ে গেল। আমার কোন সান্ত্বনা কাজে এল না, দিনে দিনে সে একেবারে পাগল হয়ে গেল।

ডাক্তাররা বললেন, সন্তান হবার পরে দুর্ব্বল দেহমনে কোন রকম শক্ লাগলে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম হয়। কখনো সেরেও যায়, আবার না-ও সারতে পারে।

কেতকীকে অনেক অনুনয় করেছিলাম, আমার জীবনকে এমন করে নষ্ট করে দিও না, একবার তুমি নিজের মুখে বলে যাও ও যা' ধারণা করে বসেছে তা' সত্যি নয়। ওকে বাঁচাও, আমাকে যদি সত্যি করে ভালবেসে থাকো, আমাকে বাঁচাও কেতকী।

কেতকী উত্তর দিলো, যা' সত্যি তাকে আমি কেমন করে অস্বীকার করবো, তোমাকে আমি ভালবাসি তার মধ্যে তো এতটুকু মিথ্যে নেই।

তারপর একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে অতসীকে আর খুঁজে পেলাম না। এসে দেখি চাঁদু একলা ঘুমিয়ে আছে, অতসী নেই। যে ছেলে তার প্রাণের প্রাণ ছিল তাকে ফেলে কেমন করে চলে গেল আজও বুঝতে পারিনি।

পাগল হয়ে মাঝে মাঝে বলে উঠতো, স্বামী মিথ্যে, সংসার মিথ্যে, সন্তান মিথ্যে, সব মিথ্যে। আমিও মিথ্যে হয়ে গেছি, তবে কেন আর বেঁচে থাকি।

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলে হাত ছুঁড়ে ফেলে দিত, ওকে স্নান করাতে, খাওয়াতে যে কত কষ্ট হয়েছে তা' বলতে পারি না। না খেয়ে খেয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, শুধু মুখের মধ্যে বড় বড় চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে থাকতো।'

হিরণ একটু থেমে নিল। খানিকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠকে পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, 'অনেক খোঁজ করেছি কোন সন্ধান পাইনি, আমার ধারণা সে আর বেঁচে নেই, গঙ্গার জলে সে তার মনের দাহ জুড়িয়েছে।' হিরণ চুপ করলো।

জলভরা চোখে লীলা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো, অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ-স্বরে প্রশ্ন করলো, 'চাঁদু কোথায় ?'

আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে হিরণ বললো, 'ওই ঘরে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন মাকে খোঁজে, ওর মা যে হারিয়ে গেছে তা' ও বিশ্বাস করে না, আমাকে কেবলি বলতে থাকে, আমার মাকে এনে দাও। অবোধ ছেলেকে কি দিয়ে ভোলাব বুঝতে পারি না।'

এবার হিরণের চোখ দিয়ে ধারায় ধারায় জল গড়াতে থাকে সে মুছবার চেষ্টা করে না। লীলাও তার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল ফেলে।

বিরাট বিস্তৃত এই পৃথিবী, সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী তার পরিধির বিস্তার, সমুদ্রের বালুবেলার একটি বালুকণার মত অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষকণা সেখানে হারিয়ে গেলে আর কি খুঁজে পাওয়া যায় ?

লীলা জানে, আর পাওয়া যায় না।

ললিতা বিকেল বেলা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল, চেঁচামিচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। উত্তেজিত হয়ে এসে সুরেশ্বর বললো, 'আচ্ছা বউদি, পাশের বাড়ীর ছাদে ঢিল ছোঁড়ে রীতি, একি অভদ্রতা বলতো ? পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলা আমি ছাদে উঠতেই ঢিলটা তুলে আমায় দেখালেন আর বললেন, দেখুন, আপনাদের মেয়েটিকে একটু শাসন করবেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। তোমার আর দাদার আদরে ও একেবারে বিগড়ে গেল। কি অন্যায় কথা দেখ দেখি। ওকে এখুনি জিজ্ঞেস করতো কেন ঢিল ছুঁড়েছিল।'

শান্তভাবে ললিতা বললো, 'আচ্ছা আমি ধীরে সুস্থে জিজ্ঞেস করবো এখন, তুমি এখন তোমার কাজে যাও, তুমি যেন আবার ওকে শাসন করতে যেও না।'

সুরেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললো 'তোমার তো ওই রকম, আমি

কিছু বলতে গেলেই উল্টে আমাকে শাসন, যা খুসী করগে, পাড়ায় মুখ দেখানো যায় না ওর জ্বালায়। সেদিন মুড়িওলীর ছোট্ট ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার ইঁটের ওপরে ফেলে দিল। কপাল কেটে রক্তারক্তি, তুমি কিচ্ছু বল্লে না ওকে, এমন করে প্রশ্রয় দিলে বিগড়ে যাবার আর অপরাধ কি।'

ঘরের মধ্যে গোপনে রীতিকে ডেকে নিয়ে ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'তুই ওদের বাড়ীতে ঢিল ছুঁড়েছিলি?'

রীতি বললো 'হ্যাঁ বউ দি। কিন্তু ওদের পচা আমায় মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল কেন? আমি তো ওর কিছু করিনি। শুধু শুধু ওর মা এসে আমায় বকতে লাগলেন।'

ললিতা বললো 'আচ্ছা, আচ্ছা, শোধ বোধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওই ঢিল ছোঁড়াটা ভালো নয়। ওদের পচার মাথাটা কেটে গেলে রক্তারক্তি কাণ্ড হতো তো, তখন লোকে তোকেই নিন্দে করতো। সেদিন মুড়িওলীর ছেলেকে ফেলে দিয়েছিলি সব্বাই তোকেই দোষ দিল।'

রীতি বললো, 'সেদিন ছেলেটা জুতো দিয়ে আমার পা অমন করে মাড়িয়ে দিল কেন? আমার লাগেনা বুঝি? তাই জন্যে তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। ও বাড়ীর পচা সব সময় আমায় বাঁদরের মত মুখ ভ্যাংচায়, আমি বুঝি কিচ্ছু বলবো না, না?'

ললিতা বললো, 'না, তুই কিছু বলবিনে তা হলে লোকে ওকেই নিন্দে করবে, তোকে প্রশংসা করবে।'

'আমি প্রশংসা চাইনে।' এই বলে রীতি ছুটে পালায়। ডানপিটে মেয়ে। আট বছর পূর্ণ হয়ে নয় চলছে, কোন জ্ঞান বুদ্ধি হল না, ললিতার ভাবনা হয়। নীতি এমনিতেই শান্ত মেয়ে, রীতির দুর্দ্দান্তপনায় সে রীতিমত ভয় পেয়ে যায়, বলে, 'বৌদি, ওর তো পড়াশোনা কিছু হল না, ওর জন্যে একজন টিচার রাখি, পরে যে কি হবে জানিনে। ছোড়দা, তুমি ওর জন্যে একজন মেয়ে টিচারএর খোঁজ কোরো, ইস্কুলে ওর পড়া কিছুই হচ্চে না।'

সুরেশ্বর বলে, 'হ্যাঁ টিচার রাখো আর ও তাকে মেরে তাড়াক, খুব মান বাড়বে, না?'

ললিতা বলে 'আরে না, না, তুমি ওকে যত দুষ্টু ভাবো ও তা' নয়, ওর কথা যদি মন দিয়ে শোনো তবে বুঝবে ওর দিকেও যুক্তি আছে।'

সুরেশ্বর বলে, 'তোমাদের যুক্তি তোমাদের কাছেই থাক্, আমায় এখন খেতে দেবে তো দাও, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

ললিতা ভাবে, সত্যি রীতিটা বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কেমন করে ওকে শাসন করবে তা' সে বুঝে উঠতে পারে না। এক বছরের রীতিকে শেষ সময়ে শাশুড়ী তার হাতেই সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর জলভরা চোখের কথা সে ভুলতে পারে না।

দেবেশ্বর আর সুষম বাল্যবন্ধু। স্কুল অতিক্রম করে কলেজেও কিছুদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিল। তারপর

দেবেশ ব্যারিষ্টারি পড়তে বিদেশে চলে যায়, সুষম দেশেই পড়াশোনা করতে থাকে।

চায়ের আসরে দুজনের তর্কের তুফান ওঠে। দেবেশের কণ্ঠস্বর যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মাঝখানে পড়ে যে থামিয়ে দেয় সে দেবেশের বোন্ সুনীতি, সে চা ঢেলে দুজনের সামনে এগিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা সুরে বলে, 'চা টা খেয়ে নাও আগে তারপর ঝগড়া করো দাদা, তর্কের বিষয় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।' তার শান্ত কণ্ঠস্বরের ছোঁয়ায় দুজনেরই উত্তেজনায় ভাটা পড়ে। সামনের ধূমায়মান চা আর খাবার দুজনকেই আকৃষ্ট করে।

চায়ের টেবিলের তর্কে মাঝে মাঝে নীতিও যোগ দেয় কিন্তু খুব কম। সে সংযতবাক্, কথা কম বলে, শোনে বেশী।

এ দেশের ও বিদেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে তুলনামূলক একটা বিষয় নিয়ে সেদিন তর্ক আরম্ভ হয়েছিল। দেবেশ যুক্তির ধার বড় একটা ধারেনা, গলার জোরে তার বক্তব্যটা প্রমাণ করবার চেষ্টায় সে উঠে পড়ে লেগেছিল। মাঝে মাঝে সমর্থনের আশায় সে সুনীতির মুখের দিকে চায়, কিন্তু নীতি কিছু বলেনা শুধু মিটি মিটি হাসে। সুষমের কাছে হেরে গিয়ে মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধারণ চেষ্টায় বিপন্ন দেবেশ বলে ওঠে 'আচ্ছা নীতি, তুইতো অর্থশাস্ত্র পড়ছিস্, তোর মতামতটাও শোনা যাক্।'

নীতি হেসে ফেলে। 'দাদা তুমি যে কি বলো, সুষমদা যেসব বড় বড় লোকদের মতামত দিয়ে তাঁর যুক্তিকে জোরালো করেছেন সেখানে তুমি আর আমি দুজনে মিললেও পাড়ি পাব না, এ তোমার বৃথা চেষ্টা।'

দেবেশ বলে, 'তুই হচ্ছিস্ গৃহশত্রু বিভীষণ, সব সময় রামচন্দ্রের দিকেই তোর পক্ষপাত, কেন রাবণ রাজা কি কম বুদ্ধিমান কম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন? বাল্মীকি মুনি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেই না তার পতন ঘটালেন। তোর কি নিজস্ব একটা মত নেই, কিচ্ছু নেই?'

'মহাজনের পথ অনুসরণ করাই তো ভালো দাদা, নিজস্ব মতের কলার ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দেবার দুঃসাহস আমার নেই। তোমরা তর্ক করো আমি এবার ছাদে যাচ্ছি, বৌদি আমায় ডাকছে।'

'যা পালা। এসো সুষম, আজ ছুটির দিন প্রাণভরে সাহিত্য চর্চ্চা করা যাক্।' সুষম বলে, 'তোমার ছুটির তো অভাব দেখিনে, আমি তো দেখি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তোমার ছুটি।'

দেবেশ বলে 'তা বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি ছুটির দিন না হলে ফাঁকি দিতে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে, কাব্য চর্চ্চা ঠিক জমে না।' দেবেশ হেসে ওঠে।

দেবেশ কোর্টে প্র্যাক্টিস্ করে, কিন্তু সে শুধু সৌখীন ব্যাপার। প্যাণ্ট কোট পরে টাই বেঁধে কোর্টে যায় আর আসে। তার স্ত্রী ললিতা বলে 'মন দিয়ে যদি কাজ করতে

তবে এতদিন কত নাম করতে পারতে, বাপের টাকা থাকাটা কোন গৌরবের কথা নয়, বুঝলে ?'

দেবেশ বলে, 'উকিল, মোক্তার হয়ে কোন সুখ নেই ললিতা, তার চেয়ে বৈষ্ণব পদাবলী পড়ি শোনো।'

ললিতা উঠে যায়, বলে 'না, আমার কাজ আছে, তুমি পড়ো, তুমিই শোনো।'

দেবেশ চট্ করে ললিতার আঁচল ধরে, সুর দিয়ে গায়,—

'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোহি প্রেম অনুরাগ
তিলে তিলে বাখানিতে
পলে পলে নূতন হোয়।'

ললিতা আঁচল টেনে বলে, 'আঃ ছাড়না আমায়, তোমার কোর্টের বেলা হল না।'

দেবেশ বলে, 'আজ আর যাবনা লতি, শরীরটা ভাল নেই।'

ললিতা হেসে ওঠে। 'রোজই তোমার ওই ছুতো, এখনই যদি সুষম বাবু আসেন তবে দেখা যাবে মোরগের লড়াই, কার গলায় কত জোর। এমন কুঁড়ে আলসে করে ভগবান তোমায় গড়েছেন দেখে আমার দুঃখ হয়। রাধাভাবে বিভোর হয়ে বৈষ্ণব কবিতা নিয়ে বেশ আছো।'

'কিন্তু সখি, কোর্টের পাইক পেয়াদাদের রক্ত চক্ষু দেখলে আর প্রেমকাব্য জমেনা, রাধাভাব মন থেকে উধাও হয়ে যায়।

বঁধু, কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণসখা হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি,'
'নিশ্চয় জানিও প্রাণমন দিয়া চরণে হইনু দাসী।'

শেষ কলিতে সুর দিয়ে ললিতা আঁচল টেনে নিয়ে পালায়। ললিতার কণ্ঠ মধুর, সে রেডিওতে কীর্ত্তন গায়।

ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে রীতি বললো, 'ও দিদি, আমার নাটাইয়ের সুতোগুলো সব জট পাকিয়ে গেছে, একটু খুলে ভালো করে জড়িয়ে দাও না।'

সুনীতি বললো, 'ও সব আমার হাতে ভালো আসে না ভাই। তোর তো যত সব ছেলেদের খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু ঘোরানো, মারবেল খেলা, কেন বসে দু'দণ্ড বই পড়তে পারিস্‌নে, যত সব হুটোপাটি খেলা তাই তোর ভালো লাগে। আন্‌তো দেখি, পারি কিনা।' এই বলে সুনীতি জট ছাড়াতে বসলো।

ললিতা ছাদে এসে বললো, 'আয় নীতি, তোর চুলটা বেঁধে দি, ও জংলীটা তো চুল বাঁধেই না, ওকে এবারও বব্‌ করে দেব। ভেবেছিলাম বড় হয়েছে, চুলগুলোও বেশ চমৎকার হয়েছে এবারে আর কাটবো না, কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমার পারবার যো নেই, মাথাটা করেছে দেখনা, যেন বাবুইয়ের বাসা।'

সস্নেহে রীতির চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে ললিতা

বললো, 'আচ্ছা রীতি, দেখ্‌তো মেয়েরা কেমন বেণী দুলিয়ে তার ডগায় ফিতের ফুল করে ইস্কুলে যায়, তোর ইচ্ছে করে না?'

মাথা ঝাঁকি দিয়ে সরে গিয়ে রীতি বলে উঠলো, 'নাঃ। বৌদি, আমার লাট্টুর নালটা ভেঙ্গে গেছে, আজই কিন্তু আমায় আর একটা কিনে দিতে হবে।'

'আচ্ছা তা দেব, কিন্তু আজ তোকে বলতে হবে তুই ইস্কুলে যাবার সময় রোজ পালিয়ে থাকিস্ কেন, গোমুখ্যু হয়ে থাকবি?'

রীতি অনায়াসে বলে, 'হ্যাঁ। পড়তে আমার ভালো লাগে না, বই দেখলে ভয় করে।'

ললিতা বলে, 'ভয় আবার তোমার শরীরে আছে নাকি? কোন কিছুকে গ্রাহ্য নেই বইয়ের বেলাতেই যত ভয়, বই কি তোকে কামড়ায়?' রাগ করে ললিতা উঠে গিয়ে নীতির চুলের রাশ নিয়ে জট ছাড়াতে বসলো।

কেবলি ললিতা নীতির চুলগুলো আঁচড়াতে আরম্ভ করেছে সুরেশ্বর চেঁচিয়ে ডাকলো, 'বৌদি, দেখবে এসো।' ললিতা ব্যস্ত হয়ে নীচে ছুটে এল, 'কি হয়েছে ঠাকুর পো?'

ঘরে ঢুকে দেখে ওর টেবিলে একদোয়াত কালি ঢালা, কাগজে পত্রে বইয়ে একেবারে মাখামাখি। সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, এ যে রীতির কাজ সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

ক্ষোভে দুঃখে সুরেশ্বরের বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, অতিকষ্টে সে উচ্চারণ করলো 'বইগুলো আমার সব গেছে।' মাথায় হাত দিয়ে সে চেয়ারে বসে পড়লো। ললিতা নিস্তব্ধ হয়ে অপরাধীর মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরেই রীতির প্রবেশ, চট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সুরেশ্বর রীতির হাতের কব্জি জোরে চেপে ধরলো, 'এইঃ! বল্ টেবিলে কালি ঢেলেছিস কেন?'

রীতি বলে, 'আঃ হাত ছাড়োনা ছোড়দা, বলছি, বলছি।' ললিতা ওর কাছে সরে গেলে সুরেশ্বর ডান হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিল 'ওর কাছে এসো না বউদি, ওকে আজ আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।'

ললিতা ভয় পেয়ে গেল। অনুনয় করে বললো, 'ছাড়ো ওকে ঠাকুর পো, অন্যায় তো খুবই করেছে, আমি বুঝিয়ে বলবো ওকে আর কখনো তোমার টেবিলে উঠবে না। হাতের কচিহাড় ভেঙ্গে যাবে, ছেড়ে দাও ভাইটি।—আবার না হয় কিনে নাও।' এই অবান্তর কথাটা বলতে গিয়ে তার গলার স্বরটা কেঁপে গেল।

ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সুরেশ্বর বললো, 'জানো তুমি ওই বইগুলোর দাম কত? নিজের হাতে আচার্য্যদেব বইগুলো আমাকে প্রেজেণ্ট করেছিলেন, ওর কি মূল্য হয়?'

দুইহাত দিয়ে রীতিকে ঠেলে দিয়ে সুরেশ্বর টেবিলের ওপর ঝুঁকে দুই বাহুর মধ্যে মুখ ঢাকলো।

ললিতা জানে। বইগুলো দেখেই সে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল, ভয়ে তার হৃৎকম্প হচ্ছিল। সে এক কাহিনী। সুরেশ্বরের যখন দশবছর বয়েস তখন একবার তার বাবার সঙ্গে তার পিতৃবন্ধু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে সে বেড়াতে গিয়েছিল। বয়সের অনুপাতে পড়াশোনায় বেশ ভালো দেখে খুশি হয়ে আচার্য্য দেব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,— বড় হয়ে তুমি কি পড়বে? সে বলেছিল, সায়েন্স পড়বে। আনন্দের আবেগে আচার্য্যদেব তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন,— বহুত আচ্ছা, তোমাকে আমি সায়েন্সের মোটা মোটা বই উপহার দেব যে গুলো অনেক উঁচুতে উঠলে পড়ে বোঝা যায়। তোমায় অতদূর অবধি উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।

সুরেশ্বর তাঁর কথাগুলো ছাত্রজীবনের 'মটো' করে এগিয়ে চলেছিল, উত্তরজীবনে সফল হয়েছে। রসায়ন বিজ্ঞানে বিদেশী মনীষীদের লেখা এই বইগুলো সেই বই।

ধাক্কা সামলাতে না পেরে রীতি ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু বৌদি যখন ধরে তোলবার জন্যে এগিয়ে এল না তখন সে নিজেই উঠে দাঁড়াল। সহানুভূতির আশায় বৌদির মুখের দিকে চাইতেই সে বিষণ্ণ মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বৌদি আর ছোড়দার ব্যবহার দেখে রীতি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। আসলে যে তার কালি ঢালবার কোন ইচ্ছে ছিল না, উঁচুতে টাঙ্গানো ছোড়দার ওই বড় ক্যালেণ্ডারটার রঙ্গীন সুন্দর ফুলের ছবিগুলো ভাল করে দেখবার জন্যেই সে টেবিলে উঠেছিল হঠাৎ পায়ের ধাক্কা লেগে

কালির দোয়াতটা উল্টে যায়, এই সত্যি কথাটা বলবার অভিপ্রায়ই তার ছিল কিন্তু সে বুঝতে পারলো এই স্বীকৃতি এখন আর কোন কাজ দেবেনা। বরং, বৌদি যখন দুপুর বেলা ঘুমিয়ে ছিল তখন পাশের বাড়ীর হুলোবেরালটা লাফিয়ে উঠে টেবিলের ওপর কালি ঢেলে পালিয়েছে এই মিথ্যে যুক্তিটা খাটবে কিনা তাই ভাবতে ভাবতে ছোড়দার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এর পরে পরেই একদিন আর একটা কাণ্ড। ছাদের আলসের ওপর ফুলের টবের সারি, তার একটার নীচে রীতির ঘুড়ির সূতো আটকে গিয়েছিল। কিছুতেই ছাড়াতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে রীতি টবটাকে ধাক্কা দেয়, তার ফলে টবটা বাড়ীর সামনের রাস্তায় সশব্দে ভেঙ্গে পড়ে, বাড়ীর সামনে লোক জমে যায়। জানলা থেকে দেখে সুরেশ্বর ছুটে নীচে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায়, তার পর হন্তদন্ত হয়ে দেবেশের ঘরে গিয়ে ঢোকে, বলে, 'দাদা, রীতি কি কাণ্ড করেছে জানো ?' দেবেশ কামাচ্ছিল, ক্ষুর থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে সহাস্যে বললো 'কি আবার কাণ্ড করলো রীতি, বলতো।' সুরেশ ব্যাপারটার বর্ণনা দিয়ে বললো, 'দিনকের দিন ও এমন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠছে যে একদিন ওকে নিয়ে পুলিস কেসে ভুগতে হবে। ভাগ্যে টবটা আগে কার্নিসের ওপর পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল নইলে মানুষ খুন হত। কি করা যায় ওকে নিয়ে বলতো দাদা, ওকে না হয় রিফরমেটারি স্কুলে দেওয়া যাক।'

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে দেবেশ বলে ওঠে, 'আরে থাম্ থাম্, আমি দেখছি। রীতিটা যে এতবড় একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে তাতো জানতাম না। আচ্ছা তুই ভাবিস্‌নে, আমি ও যাতে শোধ্‌রায় তার ব্যবস্থা করব।'

সুরেশ্বর বললো 'হ্যাঁ, তুমি তো সবই ব্যবস্থা করবে আরও বেশী বেশী করে আদর দিও।' রেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একদিন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে লীলার সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা। কাছাকাছি এসে নমস্কার দিয়ে সুরেশ্বর বলল, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।' বিস্মিত হয়ে লীলা দাঁড়িয়ে পড়লো। সুরেশ্বর অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ।

লীলা সুরেশ্বরকে চিনতো। একই কারখানায় কাজ করাতে চোখোচোখি তাদের অনেকবার হয়েছে তবে মৌখিক আলাপ ছিলনা।

সুরেশ্বর আবার বললো, 'এখানে বড় লোকের ভিড়, অনুগ্রহ করে একটু ওদিকে চলুন না।' সুরেশ্বর অত্যন্ত স্পষ্ট। দুজনে হাঁটতে লাগলো।

এক সময় সুরেশ্বর বললো, 'দেখুন আপনার কারখানার চাকুরীটা যাবার মূলে আমিও ছিলাম, সে অনুতাপ আমি ভুলতে পারছি না, যদিও জানি আপনি ইচ্ছে করেই কাজটা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আপনার সম্বন্ধে যে সব বিরূপ আলোচনা

হত তাতে যোগ দিইনি বটে তবু প্রতিবাদ করিনি সেজন্যে এবিষয়ে আমি নিজকেও দায়ী মনে করি।'

লীলা কোন উত্তর দিলনা। একটু থেমে সুরেশ্বর আবার বললো, 'আমায় যদি ক্ষমা করেন তবে একটা প্রস্তাব করি।'

লীলা বললো, 'কি বলছেন বলুন।' সুরেশ্বর প্রস্তাব করলো, 'আমার একটি ছোট বোন্ আছে, দয়া করে তাকে আপনি পড়াবেন ?'

লীলা বললো 'উঁচু ক্লাসের মেয়েকে পড়াবার ক্ষমতা আমার নেই তবে—'

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'না, না, ও মোটে আট বছরের, আর পড়াশোনা কিছু বেশী নয়, ভারি দুরন্ত মেয়ে, ওকে যদি একটু বাগে আনতে পারেন তবেই আমরা খুশি হব। অবিশ্যি দত্ত সাহেবের কারখানায় আপনি যা পাচ্ছিলেন তার তুলনায়—, তবে যতটুকু আপনার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি তার চেষ্টা করবো।'

লীলা রাজী হলো। লীলাকে ঠিকানা দিয়ে নমস্কার করে সুরেশ্বর চলে গেল।

সেই থেকে লীলা রীতিকে পড়ায়। রীতিকে আয়ত্তে আনতে তাকে অনেক কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়। হয়তো সে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছে কিন্তু যাকে বোঝাচ্ছে সে হাঁ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে টিকটিকিটার শিকার ধরবার কস্‌রৎ দেখ্‌তে মগ্ন হয়ে গেছে। ব্যর্থ শ্রম থেকে নিবৃত্ত হয়ে লীলা তাকে

গল্প বলতে শুরু করে। এই পন্থায় অনেকটা ফল পাওয়া যায়। রীতি মন দিয়ে গল্প শোনে। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, একলব্য যে হাতের আঙ্গুল কেটে গুরুকে দিয়েছিল তাতে তার লাগলো না ?'

লীলা বলে, 'না। কেন লাগলো না এসো বুঝিয়ে দি।' লীলা তাকে কাছে বসিয়ে শিবি রাজার কথা, উদ্দালক মুনির উপাখ্যান, দধীচি মুনির কথা, রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করে যায়, অত্যন্ত সহজ করে বোঝায় কেমন করে মনের ভাল লাগাতে বাইরের ব্যথা লাগা তুচ্ছ হয়ে যায়। রীতি মন দিয়ে শোনে। এত বেশী মন দিয়ে শোনে যে বাড়ীর লোকে আশ্চর্য্য হয়।

সুরেশ্বর এমন সহজ যে লীলার ওকে ভালো লাগে। তার আচরণের মধ্যে, কথাবার্ত্তায় এমন একটি পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাওয়া যায় যা' শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এ বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও লীলার পরিচয় হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি, পরিবারের বহির্ভূত একজন লোকের সাময়িক উপস্থিতিকে তারা খুব স্বচ্ছন্দ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আসবার সময় ললিতা আর নীতির সঙ্গে ওর ভদ্রতা সূচক নমস্কার বিনিময় হয় বটে কিন্তু কথাবার্ত্তা বিশেষ জমে না, লীলা মাথা নীচু করে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যায়। ছাদের একপাশে একখানা ছোট ঘরে লীলা রীতিকে নিয়ে বসে। তারপর রীতিকে পড়ানো হয়ে গেলে ছাদের ওদিককার ঘোরানো লোহার

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে বেরিয়ে যায়, তখন আর ওদের সঙ্গে তার দেখা হয়না। সন্ধ্যেবেলা রীতি যখন ছাদ থেকে নেমে আসে তখন সুরেশ্বর উপরে উঠে যায়।

লীলা বলে, 'বসুন। কিন্তু আপনি যে এখানে আসেন কেউ কিছু ভাববে না তো?'

সুরেশ্বর বলে, 'ভাবুক, লোকের সমালোচনাকে আমি গ্রাহ্য করিনে। আপনি যদি সেদিন লোকের সমালোচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দত্ত সাহেবের ওখানে থেকে যেতেন তবে আপনি যথেষ্ট মনের জোরের পরিচয় দিতেন। কিন্তু একথা ঠিক, তা হলে আজ আপনাকে যেমন করে বুঝতে পারছি তেমন করে চেনার সুযোগ পেতাম না।'

লীলা বলে, 'মেয়েদের পক্ষে লোকের সমালোচনা তুচ্ছ করা সম্ভব নয় তাকি আপনি বুঝতে পারেন না?'

'পারি। একথা অত্যন্ত সত্যি, যে, যদি আপনি তখন চাকুরীটা না ছাড়তেন তবে আপনি লোকের ভুল বোঝা থেকে, ঘৃণা থেকে পরিত্রাণ পেতেন না। দেখুন, আমরা কারখানার সবাই দত্ত সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাই সব কিছু দোষ আপনার ওপরই আমরা মনে মনে আরোপ করে বসেছিলাম, কিন্তু এটা ভেবে দেখিনি এমন মেয়েও আছেন যিনি চরিত্রগুণে তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট না হতে পারেন।'

'আমার পক্ষে কাজ না ছেড়ে উপায় কি ছিল বলুন।'

'উপায় ?' সুরেশ্বর ভাবতে বসলো। 'আচ্ছা দেখুন, মানুষ সহজ সিদ্ধান্তে মন্দটাই কেন ভেবে নেয় বুঝতে পারিনে। ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের যেমন বন্ধুত্ব হয় একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের তেম্‌নি সহজ বন্ধুত্ব হতে পারবে না কেন ? লোকে কেন এটা ধারণায় আনতে পারে না যে একটি পুরুষ আর একটি নারীর মধ্যে দেহবোধ বর্জ্জিত বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব জন্মাতে পারে। আমার তো মনে হয় এখানেই যথার্থ বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় কারণ ছেলে এবং মেয়ে দুজনে দুজনের মনস্তত্ব ধারনা করতে পারে আর দুদিককার এই মনের নিবিড় পরিচয় বন্ধুত্বকে গাঢ় করে। প্রেমের চেয়ে একে আমি ছোট জিনিস বলে মনে করিনে বরং এই আত্মিক তপস্যাকে আমি সকলের উপরে স্থান দিই।'

সুরেশ্বরের প্রত্যেকটি কথা তার বিশ্বাসের জোরে যেন সজীব হয়ে ওঠে, লীলা মুগ্ধ হয়ে শোনে, সে বলবার মত কোন কথা খুঁজে পায় না, চুপ করে থাকে।

রীতির খিল খিল হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সুরেশ্বর ঘরে ঢুকে দেখে সে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে একখানা ছবির বই পড়ছে আর নিজের মনেই হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত্ত স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে সুরেশ্বর বললো, 'কি পড়ছিস্‌রে রীতি ?' রীতি চোখ তুলে বললো, 'আবোল তাবোল পড়ছি ছোড়দা, ভারি মজার বই, টিচার

দিদিমণি আমায় দিয়েছে।' সুরেশ্বর বললো, 'টিচার দিদিমণিকে তুই ভালবাসিস্?' রীতি উত্তর দিল, 'খু-উ-ব।' আবার ও পড়ায় মগ্ন হয়ে গেল।

একদিন সুরেশ্বর লীলাকে বললো, 'আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন, এই তিনটি মাসের মধ্যেই আপনি রীতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন এনেছেন তা অভাবনীয়। এত অল্পদিনে এতটা আমি আশা করিনি যদিও আমি কি জানি কেন গোড়ার থেকেই আপনার ওপর অত্যন্ত নির্ভর করেছিলাম।'

লীলা আস্তে আস্তে বলে, 'দেখুন, এ আমার কোন কৃতিত্বের পরিচয় নয়। আমার মনে হয়, ছোটদের কাছ থেকে আমরা বড় বেশী আশা করি, তাদের ক্ষমতার অনুপাতে বেশী দাবি করি। ওদের মনস্তত্ত্ব বুঝে বুঝে ওদের সঙ্গে আস্তে আস্তে পা ফেলাটা আমরা সংসারে ব্যস্ত মানুষরা সময়ের অপচয় বলে মনে করি তাই বিরক্ত হই, ধৈর্য্য হারাই, এই জন্যেই যত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ওদের আমরা বুঝতে পারিনে ওরাও আমাদের রূঢ়তার কারণ বুঝতে না পেরে অভিমান করে, জিদ্ করে। আমরা ভেবে দেখিনে ওরা পৃথিবীর সঙ্গে কম দিন পরিচিত হয়েছে, বড়দের মত করে ভাল মন্দ বুঝতে, উচিত অনুচিতের ধারণা করতে ওদের অনেক দিন লাগবে। আর তা' ছাড়া ওদেরও বিচার বুদ্ধি আছে যা' দিয়ে ওরা আমাদেরও উচিত অনুচিত বিচার করে, সে সূক্ষ্ম জিনিসটার সঙ্গে আমাদের স্থূল বুদ্ধির প্রায়ই পরিচয় থাকে না।'

সুরেশ্বর বলে ওঠে, 'বাঃ, চমৎকার!' লীলা আবেগের বশে এতগুলো কথা বলে ফেলে লজ্জিত হয়।

সুরেশ আবার বলে 'সত্যি আপনার কথাগুলোতে এমন সূক্ষ্ম যুক্তি আছে যে মনে হয় আমি নিজেই আপনার ছাত্র হয়ে যাই। কিন্তু বুদ্ধিতে না এগোলেও বয়েসে যে আপনার চেয়ে বড় হয়ে গেছি তাই অহংজ্ঞানে বাধে।'

লীলা হাসিমুখে বলে, 'কেন, চৈতন্যদেব অত বড় জ্ঞানী হয়েও অনেক ছোটকেও অবধূত গুরু বলে মেনেছিলেন তা' জানেন তো, তা' হলে আমার শিষ্যত্ব নিতে আপনার আপত্তি থাকবার তো কথা নয়।' দুজনেই হেসে ওঠে।

একটু পরে সুরেশ্বর বলে, 'আপনার ব্যক্তিত্ব যে এত বড় তা' আগে বুঝতে পারিনি, তা' হলে অতীতের ভুলটা আর করতাম না।' লীলা স্মিতমুখে বলে, 'আপনি দেখছি আমার ভয়ানক ভক্ত হয়ে উঠলেন—' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরেশ্বর বলে, '—কিন্তু অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ হলেও চুরি করবার আমার মোটেই মতলব নেই এ কথা অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন।' আবার দুজনে হাসে।

আজ আবার চায়ের আসরে তর্কের অবতারণা। বিষয় বস্তু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ইতিহাসসম্মত কিনা।

দেবেশ বলে, 'বড় জটিল বিষয় নিয়ে তর্ক তুলেছ হে সুষম, আমার তো রীতিমত হৃৎকম্প হচ্ছে। নীতি, তুই আমার পক্ষে

থাকিস্ না হলে মোটেই জোর পাচ্ছিনা। তোর তো মহাভারত রামায়ণ ভাল করে পড়াশোনা আছে, গীতাও তুই কিছু কিছু পড়েছিস। যেখানে ঠেকে যাব তুই আমায় সাহায্য করবি। আচ্ছা, তোমরা বলছ, শ্রীকৃষ্ণ সত্যি সত্যি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি সর্ব্বগুণের আধার একজন আদর্শ-পুরুষ ছিলেন, তা' হলে তাঁর সম্বন্ধে যে সব, আচ্ছা দাঁড়াও, কিন্তু আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে,—অথচ ঐ পরকীয়া তত্ত্বই যে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ, তবে ব্যাপারটা কি রকম হল, দাঁড়াও বুঝে দেখি। আদর্শ পুরুষ, তবে—'

নীতি বলে, 'দাদা, বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে তর্কে নয় তা' তো জান, কৃষ্ণচরিত্রের যে রূপকগুলোকে আমরা স্থূল চোখে দেখি তার মধ্যে যে সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে পণ্ডিতেরা তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন, আমরা অত গভীরে ঢুকতে পারিনে বলে বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, দোষগুলোকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ চরিত্রের গুণ গুলোকেই গ্রহণ করনা কেন, সংশয় মিটে যাবে।'

দেবেশ বলে, 'আমিতো রাজহংস নই যে নীর ত্যজে ক্ষীরের ভাগটাকে উদ্ধার করে ফেলব। কিন্তু, মীমাংসাটা কি হল বুঝিয়ে দাওতো হে সুষম। তোমরা বলছ তিনি দেবতা নন্ ইতিহাসসম্মত মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর সম্বন্ধে যে সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে তা' কি করে সম্ভব হয় বলতো, মানুষ তো সত্যি সর্ব্বশক্তিমান নয়।'

নীতি বলে, 'আচ্ছা, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য দেব, রামকৃষ্ণকে

যেমন অবতার বলে স্বীকার কর শ্রীকৃষ্ণকেও ওই রকম করেই মেনে নাওনা কেন? ওঁদের জীবনেরও অনেক কিছু অলৌকিক ঘটনার জনশ্রুতি নেই কি?'

দেবেশ বলে, 'দেখেছ সুষম, এ মেয়েটি কম নন্, একেবারে গোড়া ঘেঁসে কোপ দিয়েছে। ওহে সুষম, প্রসঙ্গটা পাল্‌টে ফেলো, গতিক বড় সুবিধে মনে হচ্চেনা। তার চেয়ে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি নিয়ে আলোচনা করা যাক্, রসের সাগরে ডুবে যাবে।'

সুষম বলে, 'তা' ঠিক। কৃষ্ণতত্ত্ব আপাততঃ থাক্। শ্রীকৃষ্ণ আদৌ ছিলেন কিনা এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দুরকমের মত আছে, কোন্‌টা গ্রাহ্য কোন্‌টা ত্যাজ্য তা' বোঝা সত্যিই কঠিন, কিন্তু চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি যে ছিলেন তার প্রমাণ হচ্চ সশরীরে তুমি সুতরাং এটা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কি বল নীতি?' নিঃশব্দে নীতি হাস্‌তে থাকে। দেবেশ গুণগুণ করে, 'কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান, অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।'

নীতির মুখ হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে। সুষম লক্ষ করে অপ্রসন্ন ভাবে বলে ওঠে, 'আঃ দেবেশ, থামো তো।'

নীতি উঠে চলে যায়।

সেদিনের কথার সূত্র ধরেই সুরেশ্বর বলছিল, 'দেখুন, সেদিন আপনাকে বলছিলাম একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যে যদি দেহবোধ বিরহিত বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব জন্মায় তাকে আমি প্রেমের

চেয়ে উঁচুতে স্থান দিই। কিন্তু ভেবে দেখলাম এই জিনিসই যথার্থ প্রেম। এ যে কত বড় জিনিস সাধারণের তা' ধারণা হবার কথা নয়, একে বুঝতে হলে রীতিমত ইন্দ্রিয়জয়ের সাধনা করতে হয়। সব জিনিসেরই অনুশীলনে শক্তি বাড়ে ভালবাসার ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সাধনার সঙ্গে ত্যাগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেখানে ত্যাগের নামগন্ধ নেই শুধু ভোগ আছে তাকে প্রেম বলতে আমি অস্বীকার করি। যে প্রেমে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা না আসে, এমনকি প্রেমাস্পদকেও,—সে প্রেম, প্রেম নয়। যথার্থ ভালবাসা মানুষকে এমন এক উর্দ্ধস্তরে নিয়ে যায় যেখানে দৈহিক কামনা লজ্জা পায়। কই, এ বিষয়ে আপনার মত তো কিছু বলছেন না? আমি একাই বলে যাচ্ছি।'

সুরেশ্বরের বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় লীলা চমৎকৃত হয়, তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হয়। সে আস্তে আস্তে বলে, 'আপনার মতকে খণ্ডন করি এ সাধ্য আমার নেই। আপনি এ বিষয় নিয়ে অনেক ভেবেছেন।'

সুরেশ্বর বলে, 'সত্যিই অনেক ভেবেছি, অনেক দিন ধরে ভেবেছি। দেখুন, ফ্রয়েডিয়ানরা বলেন, দেহই নাকি স্নেহ প্রেম সব কিছুর ভিত্তি। সবরকম ভালবাসার,—ভাইবোনের ভালবাসা এমন কি সন্তান স্নেহেরও নাকি মূলসূত্র ওই, সবই নাকি দেহের ধর্ম্ম। কিন্তু আমার তা' বিশ্বাস করতে একটুও প্রবৃত্তি হয় না। মনে করুন, একটি ছেলে একটি মেয়েকে

ভাল বাসলো, তারপর তারা দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে চলে গেলো, আমি মনে করি, দূরদেশ থেকে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করে তারা ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। অনেকে বলেন,—অসম্ভব! কিছুদিনের মধ্যে সে ভালবাসার মৃত্যু হতে বাধ্য। আমি বলি,—কেন অসম্ভব? বিরুদ্ধ বাদীরা বলেন,—দেহই প্রেমের ভিত্তি। আমি বলি,—না, মন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিসকে প্রেম আখ্যা দিতে আমার মন স্বীকার করে না। জানি না আমিই সত্যি না তারা। কিন্তু আমার জীবন-বোধ যে এখানে কাজ করছে। দেখুন, আমি ভাবি যদি কখনও আমার জীবনে এমন সমস্যা আসে, আমি তার এক্সপেরিমেণ্ট করবো যে আমি সত্যবিশ্বাসী কিনা। যদি যাচাই করে বুঝতে পারি যে আমি ভুল, তবে—তবে কিসের ভিত্তির উপর জীবনকে ধারণ করবো বলতে পারেন?'

লীলা নির্ব্বাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ওকে খাড়া রেখেছে যদি কোন দিন সেই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দুর্ব্বল হয়ে যায়, দারুণ ঝড়ে উন্মূলিত মহীরুহের মত সেই ভুল ভাঙ্গার প্রচণ্ড ধাক্কা হয়তো ওকে ভূমিসাৎ করে দেবে, ভেবে লীলার ভয় করে।

সুরেশ্বর নীচে এসে বললো, 'বৌদি, ছাদে গিয়েছিলে কেন?' ললিতা থতমত খেয়ে বললো, 'তুমি কি করছো তাই দেখতে গিয়েছিলাম। কেন, ছাদে যাওয়া কি বারণ?'

'না, তা নয়, তবে সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতাটা

শোভন নয়। তার চেয়ে তুমি ঘরের ভেতরে কেন গেলে না, তোমার কাছে আমার এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না। আমি জানি আমরা কি কথাবার্ত্তা বলি তুমি গোপনে তাই শুনতে গিয়েছিলে, আর শুধু আজ বলে নয় আরও তুমি এই রকম এসেছো, কিন্তু বৌদি, কিছু ধারণা করতে পারলে ?' সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর কঠিন।

হঠাৎ ললিতা উষ্ণ হয়ে উঠলো, বললো, 'ঠাকুর পো, তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাও ?'

চট্ করে নত হয়ে সুরেশ্বর ললিতার পা স্পর্শ করলো, 'না বৌদি। তুমি আমার মায়ের মত, মা চলে যাবার পর তোমার কাছে এত বেশী স্নেহ যত্ন পেয়েছি যার তুলনা হয় না। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমার সম্বন্ধে তোমার এই অবিশ্বাস আর লুকোচুরিবৃত্তিতে আমিই তোমার জন্যে লজ্জিত হচ্ছি। তোমার কাছে এ হীনতা আমি প্রত্যাশা করিনি।'

'হীনতা ?'

দৃঢ়স্বরে সুরেশ্বর বললো, 'হ্যাঁ, হীনতা। তোমাদের মেয়েদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে। কিন্তু বৌদি, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, যা বোঝনা তা বুঝতে চেওনা, বুঝতে পারবে না। তুমি যাঁকে অপমান করতে গিয়েছিলে তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে, তুমি তাঁকে ধারণা করতে পারবে না, তাই বলছিলাম বোঝবার চেষ্টা কোরো না।'

বিদ্রূপের স্বরে ললিতা বললো, 'আচ্ছা তুমিই তবে বেশ

করে বোঝবার চেষ্টা কর আর ফুল বেলপাতা নিয়ে বসে বসে দেবী পূজো কর, আমার দরকার নেই। খুব মনের মত হয়েছে তো ?'

'হ্যাঁ বৌদি। আমি এতদিন যে মেয়েকে মনে মনে কল্পনা করে এসেছি বাস্তবে পাইনি, তোমার কাছে সত্যি কথা বলি বৌদি, উনি আমার সেই মানসী।'

'তবে বিয়ে করে ফেলনা কেন, তোমাকে আর বাধা দেবার কে আছে ?'

সুরেশ্বর দৃঢ়স্বরে বললো, 'বাধা দেবার জন্যে আমি নিজেই আছি বৌদি, মানসীকে বিয়ে করা যায় না।'

ললিতা একদিন দেবেশকে বললো, 'দেখো, আমি ঠাকুরপোর ভাবগতিক বড় ভালো দেখছিনে।'

দেবেশ শঙ্কিত হয়ে বললো, 'কেন, কেন ?'

ললিতা বলে, 'আমার মনে হয় ঐ মেয়েটা ওর পেছনে লেগেছে।'

লীলাকে দেবেশ প্রায় দেখেনি, মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধেও তার বিশেষ কোন ধারণা নেই, কানে শুনেছে যে সুরেশ্বর রীতিকে পড়াবার জন্যে একটি মেয়েকে শিক্ষয়িত্রী রেখেছে। সে বললো, 'আহা, নিজেদের জাতের সম্বন্ধে একটু সমীহ করে কথা বলো, ঐ মেয়েটা মানে কোন্ মেয়েটা ? রীতির টিচারএর কথা বল্‌ছো তো ? তা—হয়েছে কি ?'

ললিতা বলে, 'হয়েছে আমার মাথা। রোজ সন্ধ্যের পরে গিয়ে ঠাকুরপো ওর সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে যায়। কিযে সব বকে তার মাথা মুণ্ডু নেই। সন্ধ্যের পরে বাড়ীতে যার টিকিটিও দেখা যেতনা সেই ঠাকুরপো এখন বাড়ী ছেড়ে বেরোয় না।'

'আহা হা, উত্তেজিত হচ্চ কেন? ওদের সঙ্গে তুমিও বোধ হয় যোগ দাও, না হলে মাথামুণ্ডুর ধারণাটা তোমার এল কোথা থেকে?'

ললিতা বলে, 'না গো, আমি আড়াল থেকে শুনি। প্রেম, ভালোবাসা এই সব কথা হয়।'

দেবেশ বললো, 'সখি, জানো তো এটা নারী স্বাধীনতার যুগ। এককালে ছেলেরা মেয়ে পছন্দ করেছে এখন মেয়েরা ছেলে পছন্দ করবে এটাতে তো তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। তা যদি কর তা হলে তুমি পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে গেছ ধরে রাখতে হবে। দেখছো না কলেজে, পার্কে, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে, চিত্র প্রতিষ্ঠানে ছেলে আর মেয়েতে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কেউ কারুকে ছেড়ে নেই। এর ফলাফল যা' হবার তা হবেই, নতুন যুগকে তুমি তো অস্বীকার করতে পারো না। এক সময়ে মেয়েরা ছিলেন অন্তরাল বাসিনী, পুরুষের লুব্ধ চোখের অনুসন্ধিৎসাকে ফাঁক দিয়ে তাঁরা আত্মগোপন করে থাকতেন, বড় জোর আড়াল থেকে দু একটা কটাক্ষবাণ ছুঁড়ে মারতেন, তখন তোমরা ছিলে দুর্লভা। আর এখন ট্রামে, বাসে, রেস্তোরাঁ, সিনেমায়

কুন্তলিনীদের ছড়াছড়ি, কোথায়ও পুরুষদের নিস্তার নেই, তার ফলে এই রকম ঘটাটাই তো স্বাভাবিক সখি, আর কি বলতে চাও ?'

ললিতা রেগে বললো, 'তাই বলে অমন একটা সব দিক দিয়ে ভালো ছেলেকে একটা বাজে মেয়ে ভাঙ্গিয়ে নেবে, একি প্রাণে সহ্য হয় ? আমি দেখেছি, আমার এক ইস্কুলের বন্ধু,—কালো, কুৎসিত, দাঁত উঁচু, ম্যাট্রিক ফেল সে একটি ভালো ছেলেকে পেছনে লেগে কেমন করে বাগালো। ছেলেটি মুন্সেফ থেকে এখন জজ হয়েছে, সারা গায়ে জড়োয়া পরে অহঙ্কারে সবিতা যেন ফেটে পড়ছে। রাগে আমার গা জ্বালা করে।'

'ললিতা সখি, বেশ করে তোমার নিজের মনটা বুঝে দেখ দেখি গায়ের জ্বালাটা তোমার কি তার জড়োয়া গয়নার জন্যে না ভাল স্বামী পাবার জন্যে ? তাহলে অনায়াসে আমার সঙ্গে বদল করতে পার আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, অবশ্য যদি তোমার সেই বন্ধুটির আপত্তি না থাকে।' দেবেশ হো হো করে হেসে ওঠে।

ললিতা রেগে বলে, 'তোমার সবকিছু নিয়েই ঠাট্টা, এমন একটা ব্যাপারে তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই ?'

দেবেশ শান্তভাবে উত্তর দেয়, 'দেখো ললিতা, তুমি বুঝে দেখো সুরেশ বড় হয়েছে, ও যদি নিজে নির্ব্বাচন করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে তা'তে আমাদের কি হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার আছে ? আর, তার যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে

বিয়ে হবার সম্বন্ধে আপত্তিরও তো কোন কারণ দেখিনে, এতো আজকাল অ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে একটা জিনিস আছে জান তো, তাকে না মেনে তো উপায় নেই।

দেখো, তোমরা মেয়েরা ভারি পরশ্রীকাতর, কোন মেয়ে একটা ভালো বর পেল অম্নি তোমার হিংসে হবে তোমার তাতে কোন ক্ষতি থাক্ বা না থাক্, কেউ জড়োয়া গয়না গায়ে দিয়ে এলে তোমার চোখ টাটাবে, তোমার নিজের বাক্সভর্ত্তি গয়না থাকলেও। এরকম মনোভাব ভাল নয় ললিতা সখি, উদার হও, মনটাকে একটু প্রসারিত করো।'

ললিতা ঝাঁঝ দিয়ে বললো, 'তোমার তো আমার দোষ দেখা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা তোমার নিজের কথাই ধরনা কেন, তোমার যখন বিয়ে হল তখন কি তুমি বাপের বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে সাহস পেয়েছিলে ? তখন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল কোথায় ?'

দেবেশ বলে, 'রোসো দেখি, তোমার আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমার বয়েস ছিল কুড়ি, তোমার কত ছিল ? তোমার পিতৃদেব বোধহয় গৌরীদানের পুণ্যসঞ্চয়ের আশায়—'

ললিতা বলে উঠলো, 'আমার তখন ষোল বছর বয়েস ছিল গো, আমার বাবা গৌরীদানের ফল পাননি।'

'আচ্ছা যাক। আমার পিতৃদেব পাছে ছেলে বিলেতে গিয়ে বেহাত হয়ে যায় এই ভয়ে কুড়িবছরের নাবালকের পায়ে একটা জিঞ্জির বেঁধে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন, আপত্তি করবার

আর অবসর পেলাম কই? আর বিদেশে গেলে সেই ষোল বছরের অপোগণ্ড নাবালিকা যে এখান থেকে সেই জিঞ্জির টেনে রেখে আমায় এক পা-ও এদিকে ওদিকে যেতে দেয়নি তা' আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে আছে। আহা, বিয়ে না করে যদি বিলেতে যেতে পারতাম, তবে কত মজাই না ছিল।'

ললিতা এবার হেসে ফেললো। বললো, 'ষোল বছরের নাবালিকার যে এত জোর ছিল তাতো সে জানতো না, তুমি মনের সাধে সেখানে আর একটা বিয়ে করলেই তো পারতে।'

দেবেশ বলে, 'গেছি সেখানে আইন পড়তে, বে-আইনী কেমন করে করি বল? ঘরমুখো বাঙ্গালী তাই সুড় সুড় করে নিজের গর্ত্তেই ফিরে এলাম।'

ললিতা বলে 'তা যাকগে, তুমি এখন এর একটা উপায় কর।'

দেবেশ বলে, 'এর কোন উপায় নেই। তোমায় সবই তো বুঝিয়ে দিলাম।'

ললিতা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'তাই বলে যোগ্য অযোগ্য নেই? রূপে, গুণে অমন সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ে! ওর আছে কি, রূপ নেই, বিদ্যে নেই, কোন্ ছোট ঘরের একটা মেয়ে, তাকে দেখে ঠাকুরপো এমন করে মজেছে—'

দেবেশ গম্ভীর স্বরে বললো, 'ললিতা, ভাষাটাকে একটু মার্জ্জিত কোরো। যে রীতির দুরন্তপনাকে আয়ত্তে আনতে

তোমরা হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলে, এই তিন মাসের মধ্যেই তার মধ্যে যিনি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এনেছেন এ ক্ষমতার জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে না পারো অন্ততঃ পক্ষে কৃতজ্ঞ হোয়ো।' এই বলে দেবেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ললিতা লক্ষ করে নীতি আজকাল কি একরকম যেন হয়ে গিয়েছে। সব সময় অন্য মনস্ক, ভাল করে খায়না, মাঝে মাঝে কলেজে যায় না। বেশী রাত্রে ওর ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ও বিছানায় ছট্‌ফট্ করছে। ঘরে ঢোকে, কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'তোর কি হয়েছেরে নীতি, অসুখ করছে।'

নীতি ধড়মড় করে উঠে বসে, 'না তো বৌদি, এম্‌নি কেন যেন ঘুম পাচ্ছে না?'

ললিতা বলে, 'ঘুম আবার পাচ্ছে না কেন?'

নীতি বলে, 'কি জানি।' ওর মাথার দিককার জানালাটা ভাল করে খুলে দিয়ে ললিতা বলে, 'আষ্টেপৃষ্ঠে জামা কাপড় জড়িয়ে তো শুয়েছিস, ওতে কি ঘুম হয়? ব্লাউসের বোতাম গুলো খুলে ঢিলে করে দে, ঘুমোবার চেষ্টা কর, রাত জাগলে অসুখ করবে।' চিন্তিত মনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সব সময়ে সুনীতি কেমন উন্মনা হয়ে থাকে, ললিতার সন্দেহ হয় ও যেন রোগাও হয়ে যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে ডাক্তার ডাকে কিন্তু অসুখ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন

রাত্রে সে দেবেশকে বলে 'দেখো, নীতির যেন কি হয়েছে, ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না। মাঝে মাঝেই কলেজ কামাই করে, জিজ্ঞেস করলে বলে, পড়াশোনা করতে ভাল লাগছে না বৌদি। আমার মনে হয় ওর এখন বিয়ের চেষ্টা করা ভালো।'

দেবেশ বললো, 'আমার মতে বি. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলে বিয়ে দেওয়াই ভালো ছিল, তবে তোমার যদি ভালো মনে হয় সেই চেষ্টাই করো।'

'চেষ্টা করো বললেই তো হয় না, ওর আবার মন কোথাও না বাঁধা পড়ে থাকে। কলেজে পড়া মেয়ে, কোথায় কোন্ ছেলের ওপর মন পড়েছে হয়তো, বলতে পারছে না।'

দেবেশ বলে, 'তুমি তো ওর বন্ধু, তুমিই ওর মনের কথা বার করতে পারবে, চেষ্টা করে দেখো।'

সুনীতি আর কলেজে যায় না। ললিতা বারে বারে অনেক রকম করে জিজ্ঞাসা করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ওর ওই একই উত্তর,—ভাল লাগে না বৌদি। একদিন ললিতা ওকে নির্জ্জনে চেপে ধরলো, 'তোকে বলতেই হবে তোর কি হয়েছে। কোন অসুখ নেই বিসুখ নেই, কলেজ ছাড়লি কেন ? আমাকে সত্যি তোর মনের কথা খুলে বল্ নীতি, তোর কলেজের কোন ছেলেকে ভালোবেসেছিস ?' নীতি চমকে উঠলো, বললো, 'না বৌদি।' ললিতা আবার বললো, 'যদি বেসে থাকিস্ খুলে বল্, সে যে জাতই হোক না, তোর অযোগ্য না হলে

আমরা তার সঙ্গে তোর বিয়ের চেষ্টা করবো।' নীতি উত্তর দেয়না।

দিনের পর দিন তোষামোদ করে, রাগ করে, অভিমান করে কিছুতেই যখন নীতির মুখ খোলাতে পারলো না তখন ললিতা হার মানলো। শেষে এমন হল, নীতি ওকে এড়িয়ে দূরে থাকতে চায় এমনও ললিতা অনুভব করতে লাগলো। সজল কণ্ঠে দেবেশকে বলে, 'কি হল ওর কিছুই যে বুঝতে পারছিনে, কি করি বলতো ?' একটু থেমে আবার বলে, 'দেখো আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয়।' দেবেশ সপ্রশ্ন নেত্রে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ললিতা ওর কানে কানে কি একটা বলে। দেবেশ প্রথমে চম্‌কে ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'পাগল! এও কি কখনো সম্ভব ?'

ললিতা উত্তর দেয়, 'সম্ভব নয় কেন ? দেখো, শ্রদ্ধার ওপরেই ভালোবাসার ভিত্তি, ছোট বেলা থেকেই ও যে সুষম বাবুকে মনে মনে কত শ্রদ্ধা করে তা আমি জানি। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব তুমি আমার চেয়ে বেশী বুঝতে পারো না, সম্ভব নয় শুধু, হয়েছে তাই। ও প্রাণ গেলেও তো এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না, তাই দিনে দিনে অমন হয়ে যাচ্ছে। তুমি এর উপায় করো।' দেবেশ চুপ করে থাকে।

ললিতা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলছো না যে ?'

দেবেশ উত্তর দেয়, 'আমার বিশ্বাস হয় না। পাঁচ বছর

বয়েস থেকে নীতি ওকে দাদার মত দেখে এসেছে আর আজ,—তুমি কি ভয়ানক কথা কল্পনা করতে পারো, আমার ভাবতেও ভয় হয়।'

ললিতা বলে, 'এই ভয়ানক ব্যাপারই সত্যি ঘটেছে। আমি সব সময় লক্ষ করছি ও আর সহজে সুষম বাবুর সামনে যেতে চায় না, অবাধে তার নাম উচ্চারণ করে না। চা ঢেলে দেয় বটে, আড়াল থেকে ওর চোখের দিকে চেয়ে আমি লক্ষ করেছি সোজাসুজি ও সুষম বাবুর মুখের দিকে চাইতে পারে না, আরও দেখেছি ওঁর সামনে গেলে কেমন একটা মধুর আভায় ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

দেবেশ কেঁপে ওঠে। দারুণ উত্তেজনায় বিছানা ছেড়ে উঠে সে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। কি একটা বলতে যেতেই ললিতা ওর মুখ চেপে ধরলো, ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'চুপ চুপ, পাশের ঘরে নীতি জেগে আছে আমি টের পেয়েছি।' দেবেশ থেমে গেল।

এক সময়ে ললিতা নির্জ্জন ছাদে নীতির চুল বাঁধতে বসে দুইহাতে নীতিকে জড়িয়ে ধরলো, ব্যাকুল স্বরে বললো, 'নীতি, তোর এমন করে আর মুখ বুঁজে থাকলে চলবে না, আমায় তোর কথা জানতে হবে। সত্যি করে আমায় বল্ তুই কি সুষম বাবুকে—'

নীতি চম্‌কে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকলো।

একটু থেমে ললিতা আবার বললো, 'আমার এ সন্দেহ ভুল হতে পারে, তোর মুখে সেই কথাই আমি শুনতে চাই।'

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নীতি ললিতার কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিল।

ললিতা নিঃশব্দে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, খানিকক্ষণ পরে সজল কণ্ঠে বললো, 'বড় মারাত্মক ভুল করেছিস্ নীতি, মনকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা কর, তুই তো বুঝতে পারিস এ কত বড় অসম্ভব।'

ললিতা বোঝে নীতির জীবনে যে অসম্ভবের আবির্ভাব হয়েছে তাকে সে দুই হাতে রোধ করতে পারছে না, প্রাণপণ চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো এই শক্তির দ্বন্দ্বে বিপর্য্যস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়বে তার জীবন, ললিতা বেদনায় বিমূঢ় হয়ে যায়।

এক সময় সঙ্গোপনে সসঙ্কোচে ললিতা দেবেশকে বলে, 'আচ্ছা একি কিছুতেই সম্ভব হয় না যে সুষম বাবু নীতিকে—।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর দেবেশ বললো, 'না ললিতা, এ ত্যাগস্বীকার তার পক্ষে আত্মহত্যার মত হবে, আমার বোনকে বাঁচাবার জন্যে তার জীবনকে নষ্ট করবার আমার অধিকার নেই।'

সুরেশ্বর একদিন লীলাকে বলে, 'মাঝে মাঝে আপনাকে কিছু একটা বলে ডাকতে ইচ্ছে যায় কিন্তু আমি বুঝতে পারি

সেটা আমার আবেগের মুহূর্ত্ত, আবেগ প্রবণতাকে দুর্ব্বলতা বলে মনে করি তাই তাকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে।'

লীলা চমৎকৃত হয়। এ এক অদ্ভুত ছেলে, এ স্বামী হতে চায় না, প্রেমিক হতে চায় না, ভাই হতে চায় না শুধু সুহৃদ্ হতে চায়। বলিষ্ঠ অথচ মধুর এর মন, দৃঢ় অথচ কোমল এর আচরণ, অসাধারণ এ এক মানুষ; সুরেশ্বর তার জীবনে এক অভিনব আবির্ভাব।

রীতির দুরন্তপনা আর নেই, লীলা তার মধ্যে যে গল্পের বই পড়ার ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিয়েছে তার ফলে রীতি গল্পের বই পেলে তন্ময় হয়ে পড়ে। সুরেশ্বর তাকে ছোটদের ভাল লাগার মত সব বই এনে দেয়। অত্যন্ত খুসী হয়ে রীতি বলে, 'ছোড়দা, তুমি যে কি ভালো, তোমায় আমি খুব ভালবাসি।' সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'আর টিচার দিদিমণিকেও।' কৃতজ্ঞতার এই সহজ স্বীকৃতিতে সুরেশ্বর হেসে ফেলে, বলে, 'তোর লাট্টু লাটাই সব যে ছাদের এক কোনে পড়ে কাঁদছে।' মাথা ঝাঁকি দিয়ে রীতি বলে, 'থাকগে, ও আমি চাইনে, তুমি আমাকে আরও নতুন গল্পের বই এনে দিও লক্ষীটি ছোড়দা।' সুরেশ ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'নিশ্চয় দেবো।'

নীতি বলে, 'বৌদি, রীতি আমাদের খুব ভালো মেয়ে হয়ে গেছে, সত্যি ভারি আশ্চর্য্য লাগে, না ?'

ললিতা গম্ভীর ভাবে বলে, 'চিরদিনই দুরন্ত থাকবে নাকি, বড় হচ্ছে, ওর বুদ্ধি বাড়ছে না ?'

নীতি হেসে বলে, 'কিন্তু বুদ্ধিটা অল্প দিনের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে। ওকে এবার স্কুলে ভর্ত্তি করলে কেমন হয় ?'

ললিতা বলে, 'আমরা একবার তোদের নিয়ে বাইরে যাব ভাবছি, ফিরে এসে ভর্ত্তি করব।'

নীতি বিস্মিত হয়ে বলে, 'বাইরে যাবে, কেন বৌদি ?'

ললিতা উত্তর দেয়, 'তোর শরীর সারবে তাই।' নীতি বুঝতে পেরে বিমর্ষ হয়ে যায়।

দেবেশ আর ললিতা রীতি নীতিকে নিয়ে নৈনিতাল রওনা হয়ে গেল। তার অল্পদিন পরেই সুরেশ্বর ভাল ছাত্র হিসেবে একটা স্কলারশিপ পেয়ে ডক্টরেট নেবার জন্যে আমেরিকায় চলে গেল।

একদিন লীলা আমেরিকাযাত্রী একখানা জাহাজ থেকে সুরেশ্বরের চিঠি পেল।

লিখেছে,—

'এই আমার আপনাকে লেখা প্রথম আর হয়তো শেষ চিঠি। গন্তব্য স্থানে গিয়ে কাজে জড়িয়ে পড়বো। তার মধ্যেও সময় করে চিঠি লেখা যায় জানি কিন্তু চিঠির সেতু বেঁধে মনের সেতুর যোগাযোগকে অসম্মান করতে চাইনে।

এ আমার কঠিন পরীক্ষা। আমার স্মৃতিতে যে মানস প্রতিমা জেগে রইলো তাকে আমি বস্তু নিরপেক্ষ করে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, দেখি বেঁচে থাকে কিনা। নিরবলম্ব, শুধু স্মৃতির মধু দিয়ে রচনা করা মূর্ত্তিকে দিনের পর দিন মনের মণিকোঠায় জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করবো, দেখি তা সম্ভব কি না ; এখানেই আমার জীবনবোধের পরীক্ষা। যদি হেরে যাই তবেই হয়তো সেদিন আমার লজ্জা আপনার কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন হবে, নইলে নয়।

আবেগকে প্রশ্রয় দিতে আমার ঘোর আপত্তি তা' আপনি জানেন, তবু আজ মনে মনে প্রাণ ভরে ডাকছি, বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু।'

ট্রামে দেখা।

মেয়েদের আসনেও বসবার জায়গা নেই দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো লীলা, হঠাৎ পাশের একটি স্থান খালি করে দিয়ে একজন সুদর্শন যুবক উঠে দাঁড়ালো, মৃদুস্বরে অনুরোধ করলো, 'আপনি এখানে বসুন।' ছেলেটির মেয়েটিকে যেন চেনা চেনা মনে হয়, কিন্তু কোথায় যে দেখেছে তা' ঠিক মনে করতে পারে না। কোন আত্মীয় কি বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে, না, কোন সভাসমিতিতে, না, কোথাও পথে? মনে পড়ে না।

লীলা তার দিকে একবার মাত্র চোখ তুলে চাইলো, কিন্তু তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ না করে কাঠের দেয়ালে হেলান

দিয়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। ছেলেটি বিস্মিত হল, যে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেয়েটির চোখে দেখবে আশা করেছিল তার বদলে যে দৃষ্টি একবার তার চোখের সঙ্গে মিলেছিল তা' মোটেই স্নিগ্ধ নয়, আত্মমর্য্যাদার দীপ্তি তাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে। কত বার কত মেয়েকে ট্রামে বাসে সে এমন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাকে প্রত্যাখ্যান কেউ করেছে বলে তো মনে পড়ে না। আরও আশ্চর্য্য, সারাপথ একবারও আর মেয়েটি তার দিকে ফিরে তাকায়নি, সহানুভূতি প্রকাশের পরিবর্ত্তে পাওনা হিসেবে যা' তার প্রাপ্য মনে হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত ব্যবহারটা সুষমের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকলো।

আপার সার্কুলার রোডের মোড়ে মেয়েটি ট্রাম থেকে নামলো, সুষমও তার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো, কি খেয়ালের বশে সে অলক্ষ্যে থেকে মেয়েটির সঙ্গ ধরলো।

একটা গলিপথ ধরে লীলা এগিয়ে গেল, তারপর বাড়ীর সামনে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল, সে ভেতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করে দিল। দূর থেকে তার ঠিকানা দেখে নিয়ে সুষম নিজের কাজে ফিরে গেল কিন্তু এই মেয়েটির কথা কিছুতেই তার মন থেকে সরলো না। দেখতে এমন কিছু সুন্দরী নয়, কিন্তু ইস্পাতের তরবারির মত দীর্ঘ, ঋজু গঠন, তেমনি বোধ হয় শক্ত মন ; ওর সঙ্গে যেমন করে হোক পরিচয় করতে হবে এই সংকল্প সুষমের মনে বাসা বাঁধলো। কিন্তু ট্রামে দেখা এক

অচেনা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হওয়া কি সম্ভব ? অমনতো হাজারো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। মাঝে মাঝে সুষম এদিকে আসে। যদি কখনও মেয়েটি বাড়ীর বাহিরে আসে, যদি কোন সূত্রে হঠাৎ আলাপ হয়ে যায় এই আশায়। নিজেরই তার অবাক লাগে এই অদ্ভুত নেশায়, নিজের খেয়ালের সে নিজেই কোন অর্থ খুঁজে পায় না।

একদিন মেয়েটি সত্যিই দরজা খুলে সোজাসুজি পথে নেমে এল। পরণে আট পৌরে শাড়ী, পায়ে হাল্‌কা চটি, বেশ বোঝা যায় সে বাহিরে কোথায়ও যাবার জন্যে মোটেই প্রস্তুত হয়নি। সুষম পথের একপাশে সরে দাঁড়ালো, কিন্তু মেয়েটি গলিতে বেরিয়ে এসে একেবারে সুষমের মুখোমুখি ফিরে দাঁড়াল, বললো, 'আপনাকে মাঝে মাঝে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আপনি কি কারুকে খুঁজছেন ?'

সুষমের মুখের চেহারা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল, সে আমতা আমতা করে বললো, 'না,—এমন কারুকে—'

মেয়েটি বাধা দিয়ে বললো, 'আমি জানি যে আপনি আমাকেই খুঁজছেন, সেদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে আপনি আমার পেছনে আমাদের বাড়ী অবধি এসেছিলেন তা' আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু কেন বলুনতো ?'

সুস্পষ্ট এই অভিযোগে সুষমের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, তাই সে নিরুত্তর হয়ে রইলো।

মেয়েটি তখন একটু হেসে বললো, 'আপনি বোধহয় কলেজে পড়েন, বই খাতা হাতে দেখছি। যান্, পড়াশোনা করুন গিয়ে, মেয়েদের পেছনে আর ঘুরবেন না।'

মেয়েটির এই মুরুব্বীয়ানায় আহত সুষমের মুখ লাল হয়ে উঠলো, এতক্ষণে তার মুখে কথা ফুটলো। সে উত্তর দিল, 'না, আমি এখন আর পড়িনে, পড়াই। যাক্, আমাকে মাপ করবেন আপনি, যদি আমাকে সুযোগ দেন তবে কেন আমি আপনাকে অনুসরণ করেছিলাম তাই বলতে চাই।'

লীলা বললো, 'বেশ তো, আসুন না ঘরে বসেই বলবেন এখন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কোন সুবিধে নেই।'

সুষম গম্ভীর স্বরে বললো, 'চলুন।'

লীলা সুষমকে ঘরে এনে বসাল, বললো, 'বসুন একটু, আমি আসছি।' এই বলেই সে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেল, সুষম চুপ করে বসে রইলো। অল্পক্ষণ পরেই পাশের ঘর থেকে এক কাপ চা আর কয়েক খানা বিসকুট নিয়ে লীলার আবির্ভাব, সুষম আশ্চর্য্য হয়ে বললো, 'এ আবার কি।'

লীলা একটু হেসে জবাব দিল, 'আপ্যায়ন। আপনি তো এখানে অভ্যাগত, সামান্য এক পেয়ালা চা নিন্।'

সুষমও এবার হেসে ফেললো, বললো, 'বর্ত্তমানে এক পেয়ালা চায়ের আমার বড়ই দরকার ছিল, যা' ভয় আপনি দেখিয়েছেন ভেবেছিলাম পুলিসেই দেবেন হয়তো,—উঃ, গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

লীলা খিল খিল করে হেসে উঠলো। মনে হল ঝরণাতলের নুড়ি পাথরের কলঝঙ্কার যেন দূর থেকে বাতাসে ভেসে এলো। এক মিনিট সুষম অবাক হয়ে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো, 'দেখুন, আমার বক্তব্যটা আপনাকে বলেই নিই, আবার যদি কোন বাধা আসে। আপনি আমাকে যে ভুল বুঝেছেন সেই ভুলটাই চিরন্তন না হয়ে থাকে তাই—'

লীলা বললো, 'আপনার কোন ভয় নেই, এ বাড়ীতে বাধা দেবার মত কেউ নেই। এখানে থাকেন শুধু আমার মা, তিনিই আপনার চা করে আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বিস্মিত সুষম বলে উঠলো, 'কিন্তু তিনিতো আমাকে জানেন না। আর, আমি তো অপরাধী—'

লীলা বললো, 'আমার মা না জানা ছেলেকেও স্নেহ করতে পারেন, অপরাধীকেও ক্ষমা করতে জানেন তিনি ; কিন্তু আপনি চা টা কই খেলেন না তো, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর একবার তৈরী করে আনি।'

তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে সুষম বললো, 'নাঃ, ঠিক আছে। আচ্ছা, মাকে কি আমি এক বার প্রণাম করতে পারিনে ?'

লীলা বললো, 'যখন সময় আসবে আর সত্যিকার শ্রদ্ধা আসবে তখন নিশ্চয়ই পারবেন, কিন্তু আমার মাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই আপনাকেও করতে হবে তার তো কোন অর্থ হয় না। এবারে বলুন তো আপনি কেন আমার পেছনে লেগেছেন, গোয়েন্দা নন্ তো ?'

সুষম হেসে ফেললো, 'গোয়েন্দা হলে আপনার কাছে বোকার মত ধরা পড়তাম না, এবারে আমার বক্তব্য বলি শুনুন। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি এখানকার একজন সুপরিচিত ব্যারিষ্টারের ছেলে, বাড়ীঘর এখানেই কাজেই গা ঢাকা দেবার কোন সুবিধে নেই, আর নিজেও এখানে একটা কলেজে পড়াই। আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমরা একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, সম্প্রতি একখানা বই আমরা অভিনয় করবো বলে ঠিক করেছি, একটি তেজস্বিনী মেয়ের পার্টে অভিনয় করবার মত মেয়ে চাই।'

লীলা বললো, 'তাই বুঝি পথে ঘাটে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?'

সুষম এবার সাহস করে বললো, 'না, তা' ঠিক নয়, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন আপনাকে চোখে লাগলো, মনে হল আপনাকেই আমাদের চাই।'

লীলা এবার গম্ভীর হল। বললো, 'আপনাদের চাওয়া না চাওয়ার প্রশ্নে আমার কোন প্রয়োজন নেই, এই জন্যে আপনি আমার পেছনে লেগেছেন ভাবলে ভারি অদ্ভুত মনে হয়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেন না কেন ?'

'দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। আমরা শিক্ষিতা ভদ্রঘরের মেয়ে চাই, আমাদের বোনেরা, কারু কারু স্ত্রীও অভিনেত্রী আছেন।'

লীলা কৌতূহল ভরে প্রশ্ন করলো, 'আপনার স্ত্রীও তাহলে—'

সুষম উত্তর দিলো, 'না আমার স্ত্রী নেই, আমি বিয়ে করিনি, তবে আমার একটি খুড়তুতো বোন এতে আছে। আচ্ছা, আজ তবে আসি, যদি এর মধ্যে আপনার মত বদলায় তবে,— আচ্ছা আমার ঠিকানাটা না হয় নিয়ে রাখুন, একখানা কার্ড অনুগ্রহ করে লিখে দেবেন।'

লীলা বললো, 'মত আমার মিনিটে মিনিটে বদলায় না, তবে ভেবে দেখবো। আর, আপনি যদি ইচ্ছে করেন তবে মা'র সঙ্গে দেখা করতে যে কোন দিন আসতে পারেন।'

'আচ্ছা,—' বলে সুষম নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় নামলো।

অপরাহ্নের দিকে সুষম এসেছিল। বললো, 'লীলাদেবী, বসুন, আমার একটি আবেদন আছে।'

'আপনার আবেদন আর নিবেদনের পালা তো চলছেই, আপনাকে বিনয়ের একটি অবতার বললে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয় না, কি বলবেন বলুন।'

সুষম বললো, 'আঃ, সেদিন আপনি যা' অভিনয় করলেন তা' অপূর্ব্ব! শুধু আমি বলছি না, যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বলেছেন।'

লীলা বললো, 'তারপর?'

'আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।' এই বলে দু'এক মিনিট একটু ইতঃস্তত করে সুষম আবার বললো, 'আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিল্ম প্রডিউসার, তিনি আপনার

অভিনয় দেখে বলেছেন,— কি বলেছেন শুনবেন? বলেছেন, এমন একটি জাতশিল্পীকে যদি আমাদের ষ্টুডিয়োতে পাই তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। আর,—আর এই ফুলের তোড়াটা তিনি আপনার সম্মানার্থে—' হাত বাড়িয়ে সদ্যবিকশিত রক্তগোলাপের সুরভিময় তোড়াটাকে হাতে নিয়ে লীলা বললো, 'বাঃ চমৎকার। আপনার বন্ধুকে বলবেন, তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন তাই আমার এ ফুলের তোড়াকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হলো না, কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করেছেন সে সম্বন্ধে এখনই কোন মতামত দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।'

সুষম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললো, 'সে তো বটেই, না ভেবে চিন্তে তো আপনি কোন একটা বিষয়ে মত দিতে পারেন না, তবে যদি একটু আশ্বাস দেন, বন্ধুটিকে গিয়ে সেকথা বলতে পারি।'

লীলা বললো, 'অনিশ্চিত বিষয়ে এখনই আশ্বাস দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সুষম আবার বললো, 'তা তো বটেই, সে তো ঠিক কথাই—' এইটুকু বলেই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সে চুপ করে গেল।

লীলা বললো, 'বসুন সুষম বাবু, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।' সুষমকে আপত্তির অবসর না দিয়ে লীলা উঠে গেল।

চা সামনে নিয়ে নিঃশব্দে সুষমকে বসে থাকতে দেখে লীলা প্রশ্ন করলো, 'আপনি এত কি ভাবছেন তা' তো বুঝতে

পারছি না। এদিকে আপনার চা যে জল হয়ে গেল। মনে হচ্চে আপনি যেন কিছু বলতে চান যা' আপনার বলতে বাধছে, কিন্তু আমি ভরসা দিচ্ছি আপনি নির্ভয়ে বলুন, আমার কোন নিন্দের কথা হলেও আপনি পিছ্ পা হবেন না।'

সুষম অপ্রতিভভাবে একটু হাসলো, তারপর বললো, 'বলতে সত্যিই বাধছে, আপনি যদি অভয় দেন তবেই বলতে পারি। আচ্ছা, আমার বন্ধু না হয়ে আমি নিজেই যদি ফিল্ম প্রডিউসার হই আপনি কি তা' হলে আমাকে ক্ষমা করবেন এই ছলনার জন্যে?'

লীলার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর সে বললো, 'দেখুন, আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, আমার সঙ্গে ছলনার সুযোগ নেবেন আপনি এটা আশা করিনি। আমি যদি জানতাম এ ফুলের তোড়া আপনার উপহার তা' হলে আমি গ্রহণ করতাম না। আপনার বন্ধুর নাম করলেন তাই ভেবে ছিলাম যিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত তাঁর পক্ষে এটা শুধু অবিমিশ্র শ্রদ্ধার দানই হওয়া সম্ভব, কিন্তু—'

মাথা নীচু করে সুষম বললো, 'এখনও একে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার দান বলেই ধরে নিন্‌না কেন, আমিও একজন গুণগ্রাহী বইতো নই, তার চেয়ে বেশী দাবি করবার আমার আর কি অধিকার আছে? আচ্ছা, আমায় ক্ষমা করবেন লীলাদেবী, আপনি যদি অনিচ্ছুক না হন তবে আমি আবার আসবো কিন্তু যদি—' বলতে বলতে সুষম উঠে দাঁড়ালো।

লীলা স্নিগ্ধস্বরে বললো,. 'আপনি দুঃখিত হবেন না সুষম বাবু, আপনার জন্যে এ ঘরের দরজা খোলাই রইলো, আপনি যখনই ইচ্ছে করবেন তখনই আসবেন। এই মহানগরীর মানুষের অরণ্যে আপনি আমার একজন শুভকামী সে কথা তো অস্বীকার করতে পারিনে।'

সুষম প্রায়ই আসে। নারায়ণীর হাতের তৈরী চা আর খাবার খায়, বলে, ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি।

নারায়ণী স্নেহে বিগলিত হন। মাঝে মাঝে নানারকম রান্না করে সুষমকে খেতে বলেন। লীলা হেসে বলে, 'সুষম বাবু, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি আমার চেয়ে এখন আপনিই মা'র কাছে বেশী আদরের, আমাকে আর মা ভুলেও খিদে তেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা করেন না।' সুষম হেসে ওঠে।

লীলাকে চলচ্চিত্রঅভিনয়ে অনুমতি দিতে নারায়ণীকে অনেক চিন্তা করতে হয়েছিল। সুষমের অপরিসীম আগ্রহে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। এর কিছু দিন পরেই সুষমের অনুরোধে নারায়ণী লীলাকে নিয়ে বস্তির ঘর ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জের দিকে একখানা ছোট বাড়ীতে উঠে আসেন।

বস্তি জীবনের একটি বছর লীলার পক্ষে সুখের নয় তবু নানা জনের সুখ দুঃখ বিজড়িত, বহুর বিচিত্রতায় অনুরঞ্জিত এই দিনগুলির সঙ্গে তার জীবনের যে যোগসূত্র গেঁথে গিয়েছিল তা' ছিন্ন করে দূরে যেতে নিগূঢ় বেদনায় তার মন টন্‌টন্ করে ওঠে।

যাবার দিন সকাল বেলায় রুগ্না বৌটির স্বামী যখন ঘরে ছিলনা তখন লীলা তার কাছে বিদায় নিতে গেল। ঘরের দরজায় পা দিতেই বৌটি চট করে বিছানার উপরে উঠে বসলো, চেঁচিয়ে উঠলো, 'এসোনা, এসোনা, এ ঘরে কেউ ঢোকে না, আমার কালরোগ হয়েছে ছোঁয়াচ লেগে যাবে। নিজেতো মরতেই বসেছি, আর একজনকে মেরে যাবার পাপভাগী কেন হই ভাই।'

লীলা হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, একটু এগিয়ে এসে সান্ত্বনার স্বরে বললো, 'না, না, আপনি ভাল হয়ে যাবেন, কিন্তু আপনার স্বামী আপনাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করছেন না কেন, সেখানেই তো আপনার চিকিৎসা আর শুশ্রূষা ভালভাবে হতো।'

বউটি বললো, 'হাসপাতালে দিয়ে তো মুক্তি পেতেই চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে জায়গা হলো না। যমের বাড়ীতে জায়গার অভাব হবে না ভাই, স্বামীর মনে যার এতটুকু ঠাঁই নেই বেঁচে থাকবার তার কি দরকার বলতো? এখান থেকে চলে যাচ্ছ ভালো কথা, এবারে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে। তোমার মত মেয়েকে এখানে মানায় না ভাই।'

বিদায়ের সময় সেবা দুইহাত ধরে বলেছিল, 'অনেক জ্বালিয়েছি কিছু মনে রাখিস্‌নে ভাই। আমার জীবন তো বৃথাই গেল, তুই তো এক সময়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরবি, যেন সুখী হোস্‌। মানিক তোকে বড় ভাল বাসতো, যদি কখনো তোর

কাছে ফিরে আসে তবে পাঠিয়ে দিস্, জানিস্ তো ওকে হারিয়ে কি করে দিন কাটছে।' চোখের জলে সেবার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

লীলা জানে জগতে নিছক ভালো আর নিছক মন্দ বলে কিছু নেই। জীবনের সহজ ধারা প্রবাহ যেখানে রুদ্ধ হয়ে যায় সেই বদ্ধজলা যে পঙ্কিল হয়ে উঠবে এতো স্বাভাবিক, সেবার কি অপরাধ? প্রেমের যে স্পর্শমণি মানুষের জীবনকে সোনা করে তার ছোঁয়া যে পেলনা জীবনে, তার মত মন্দভাগিনী কে আছে? সেবাকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিল, তার দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে সে নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করলো।

ষ্টুডিয়ো থেকে ফিরতে যেদিন রাত হয়ে যায় সুষম সেদিন লীলাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যায়। নারায়ণী বলেন, 'সুষম, রান্না হয়ে গেছে, খেয়ে যাওনা কেন বাবা।'

সুষম মোটেই আপত্তি করে না, লীলা আর সুষম টেবিলের দু'দিকে দুজন বসে। খেতে বসে নানা দেশ বিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে, স্বদেশ বিদেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সুষম অনেক কিছুর অবতারণা করে, কোন কোন বিষয়ে লীলার মতামত জিজ্ঞাসা করে। লীলা বলে, 'আমি তো বিদুষী নই, আমার মতামতের মূল্য কতটুকু বলুন তো?'

সুষম বলে, 'বিদুষীর আমার প্রয়োজন নেই, আমার দরকার একটি বুদ্ধিমতী মেয়ের সাহচর্য্য, যার সাহায্যে আমি আমার

কল্পনাকে রূপ দিতে পারবো। আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করি, আমি আপনাকে আর একটি অনুরোধ করবো, আপনাকে কিছুটা গান বাজনার অনুশীলন করতে হবে।'

সবিস্ময়ে লীলা বললো, 'আমাকে! অনুশীলন করলেই কি অধিকার জন্মায় সুষম বাবু, ওটা জন্মগত ক্ষমতা।'

সুষম বললো, 'কতকটা বটে। কিন্তু আপনার যে সঙ্গীতের ওপর জন্মসত্ব নেই তা' জানলেন কি করে? কখনো কি পরীক্ষা করেছিলেন?'

লীলা বললো, 'না। সঙ্গীতে অনুরাগ ছিলনা তা বলতে পারিনে, কিন্তু অনুশীলনের কখনও সুযোগ হয়নি।' সুষম নিজে সঙ্গীতজ্ঞ। লীলা তার কাছেই প্রথম পাঠ নিল। সঙ্গীত চর্চ্চার মাধ্যমে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে নতুন রকমের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সুষম লীলাকে কিছু কিছু পড়াশোনাও করাতে লাগলো।

একদিন সকাল বেলা লীলা চাকরের মুখে শুনলো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে খুঁজছেন। সে বাইরে এসে চমকিত হয়ে দেখলো রাজীবলোচন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, লীলা তাঁকে ঘরে এনে বসালো। এই দুই বছরে তাঁর বয়স যেন দশবছর বেড়ে গেছে, শরীর জীর্ণ হয়েছে, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। প্রণাম করে সে নিঃশব্দে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিকক্ষণ রাজীবলোচন কথা বলতে পারলেন না, মনে হল তিনি যেন প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করছেন। হঠাৎ কম্পিত

দেহে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি লীলার দুখানা হাত জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'মা, তুমি কি জানো রঞ্জনের কোন সন্ধান, যদি জানো—' আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না, নিঃশব্দে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। লীলা তাঁর বাহুমূল ধরে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসাল, ধীরে ধীরে বললো, 'আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাঁর কোনই খোঁজ জানিনে।' চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে রাজীবলোচন এলিয়ে পড়লেন।

লীলার অনেক অনুরোধেও রাজীবলোচন থাকতে রাজী হলেন না, একটু প্রকৃতিস্থ হতেই চলে গেলেন। লীলা পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তাঁর জরাজীর্ণ দেহ, শ্লথ পদক্ষেপ লীলার মনে বেদনার দাগ এঁকে দিয়ে গেল।

তিন বছর কেটে গেছে। এই তিন বছরে সিনেমার জগতে অনেক খানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে লীলা, এতে সব চেয়ে সুখী হয়েছে সুষম, যেন লীলার মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়েছে সে। সঙ্গীতকলাকেও লীলা কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে, খানিকটে পড়া শোনার জ্ঞানও তার হয়েছে, সুষমের অক্লান্ত সাধনায় যেন নতুন রূপ নিয়ে গড়ে উঠছে লীলা।

অনেক সম্ভাবনার আশ্বাস তার মধ্যে দেখতে পেয়ে নতুন সৃষ্টির কাজে সুষম সমস্ত প্রাণমন ঢেলে দিয়েছে। লীলা যেন তার এক অভিনব আবিষ্কার। এই সৃষ্টির উন্মাদনা তাকে দিনরাত্রি বিশ্রাম দেয় না, দিনের মধ্যে অনেক সময়ই সে

এখানে থাকে, কলেজে পড়ানোর কাজ সে ছেড়ে দিল। লীলা ঘোর আপত্তি করে বলে, 'একি করছেন আপনি, আমার মত একজন তুচ্ছ মেয়ের জন্যে আপনার নিজের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে একি ভুলের মধ্যে আপনি জড়িয়ে পড়লেন বলুন তো?' লীলার কণ্ঠে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

সুষম বলে, 'লীলা, কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা ঠিক তা' বুঝতে মানুষের অনেক সময় কেটে যায়, হয়তো সারা জীবনেও মানুষ তার নির্দ্দেশ করে উঠতে পারে না; কিন্তু আনন্দের সন্ধানে মানুষ রাত্রি দিন ছুটছে, আমি যদি এতে আনন্দ পাই তুমি বাধা দিওনা লীলা!'

ব্যবহারিক জীবনের যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের যে এক অতি সূক্ষ্ম বন্ধন তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তা' পরস্পরের কল্যাণ কামনার, আত্মত্যাগ স্পৃহার, স্নেহে পরিপূর্ণ আনন্দিত শ্রদ্ধার। দুজনের সহজ মেলামেশার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই, নেই কোন সঙ্কোচের জড়তা, মনে হয় যেন তারা দুজনে কত কালের পরিচিত।

নারায়ণীর মনে নতুন আশা ছোঁয়া দেয়।

অনেক দ্বিধা সঙ্কোচের পর একদিন নারায়ণী লীলাকে বললেন, 'লীলা, আমি তোকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'

লীলা বললো, 'মা, তুমি আমায় কি বলতে চাও তা' আমি অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তুমি যা চাও তাতো সম্ভব নয় মা।'

নারায়ণী আবার বললেন, 'কিন্তু সুষমের মত ছেলেকে তুই প্রত্যাখ্যান করিস্‌নে লীলা, আমি জানি ও তোকে কত ভালবাসে, ওকে পেলে তোর জীবন সার্থক হবে লীলা।' নারায়ণীর কণ্ঠে অনুনয় বেজে উঠলো।

বাণবিদ্ধ পাখীর মত সহসা ধৈর্য্য হারিয়ে তীক্ষ্ণ আর্ত্ত-স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো লীলা, 'মা, আজই তুমি রঞ্জুদাকে ভুলে গেলে ?'

নারায়ণীর চোখের প্রান্ত ভিজে উঠলো, তিনি বললেন, 'সে যে আমার কতখানি মন জুড়ে আছে তা' আমিই জানি। আজ প্রায় পাঁচ বছর হতে গেল সে ফেরেনি, জীবনে হয়তো তার সঙ্গে তোর আর দেখা হবে না।'

'তবু আমি তাঁরই পথ চেয়ে থাকবো, তুমি আমায় আর কোন অনুরোধ ক'রনা মা।' নারায়ণীর বুকের ওপর লীলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নারায়ণী বললেন, 'কিন্তু সুষমের জীবনকে ব্যর্থ করবার তোর তো কোন অধিকার নেই লীলা, তোর জন্যে সে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে তা তো আমি জানি—'

বাধা দিয়ে লীলা বললো, 'মা, তিনি আমাকে যে ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন তার ঋণ শোধ করবার পথ এ নয়, সে ঋণ শোধ হয় না মা।'

দিনের পর আরও কিছুদিন কেটে গেল। একসময় নারায়ণী লীলাকে বললেন, 'লীলা, এখানে তো আমার কোন কাজ নেই, আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে। আমার সামনে তো আর কোন লক্ষ্য নেই, ভবিষ্যতের কোন আশা নেই, তোকে নিয়ে,—তোর সংসার নিয়ে সংসারী হব ভেবেছিলাম কিন্তু ভগবান সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। কোথায়ও আমি আর শান্তি পাচ্ছিনে লীলা, বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলায় গিয়ে দেখি যদি শান্তি পাই।' সুষম অনেক আপত্তি করেছিল, বলেছিল, ছোট বেলায় যখন মাকে হারিয়েছিলাম তখন সে দুঃখ বুঝতে পারিনি।

নারায়ণী তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সংসারে আমার কাজ ফুরিয়েছে বাবা, আর তো থেকে কোন প্রয়োজন নেই। তোমাকে আমার আর আশীর্ব্বাদ করবার কিছু নেই, তুমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ পেয়েছো।

লীলা নারায়ণীকে বাধা দেয়নি। সে সুখী করতে পারলো না তার দুঃখিনী মাকে, সে অপরাধের বেদনা তার বুকে কাঁটার মত বিঁধে রইলো, রাত্রির অন্ধকারে চোখের জলে সে মাথার বালিশ ভিজিয়ে ফেললো কিন্তু নিঃশব্দে মাকে বিদায় দিল।

যাবার সময় নারায়ণী লীলাকে বললেন, 'তোর জন্যে আর আমার ভাববার কিছু নেই, যিনি ভাববার তোর জন্মের সময় তিনিই সব ভেবে রেখেছিলেন। তুই যে রক্ষাকবচ পেয়েছিস্ আমি জানি তাই তোকে রক্ষা করবে।'

সুষমই গিয়ে নারায়ণীকে কাশীতে রেখে এল।

আষাঢ়ের মেঘমেদুর সন্ধ্যা। দিন শেষের আগেই অন্ধকার নেমেছে। সেতারের তারে লীলা পুরিয়াধনশ্রী রাগে ঝঙ্কার তুলেছিল। ভাবগম্ভীর সুরের পরিবেশে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একটা নিবিড় স্পর্শ তার সমস্ত মনকে যেন ভরে দিয়েছিল। সে ছোঁয়ার যেন প্রাণ আছে, সুরের আকর্ষণে কাছে নেমে এসে মীড় মূর্চ্ছনা তাল লয়ে মূর্ত্ত হয়ে আকাশ যেন তার কোমল স্নিগ্ধ আবেষ্টন দিয়ে লীলার চিত্তকে ঘিরে ধরেছে। লীলা চোখ বুঁজে তাকে অনুভব করছিল, ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল পড়ে তার গাল ভিজে যাচ্ছিল। একসময় তার আঙ্গুল থেমে গেল, থেমে গেল সেতারের ঝঙ্কার, ভাবনার অনন্ত সাগরে সে ডুবে গেল।

পাওয়া না পাওয়ার হিসাব করতে মন তার প্রবৃত্ত হতে চায় না। অষ্ট্রীচ্ পাখীর মত দিনের নানাকাজের ভিড়ে মুখ লুকিয়ে জীবনের ব্যর্থতার বেদনাকে সে ভুলতে চায়, কিন্তু পারে না। তার নিজের কাছেও যখন অস্পষ্ট ছিল সে কথা সেই অবুঝ বালিকাকালে সে ভালোবেসেছিল। কৈশোরের স্বপ্নলোকে যে ছিল তার ধ্যানের ধন, উন্মেষিত যৌবনে তাকেই অবলম্বন করে ছায়াস্নিগ্ধ এক গৃহকোণে সে আনন্দের স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল, বালির ঘরের মত ভেঙ্গে গেল তার কল্পনার প্রাসাদ ; অজানার অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল তার জীবনের সার্থকতা।

সে নিজে কখনও জানতো না যে তার মধ্যেও সঙ্গীতের

প্রতিভা আছে। ছোট বেলায় ভালো লাগতো পথভিখারীর একতারা বাজিয়ে বাউল সুরের গান, নদীর বুকে নৌকোর মাঝির সারি গানের ভাটিয়ালি সুর। সে দিনের হাসি চঞ্চলতার মধ্যে যা' প্রচ্ছন্ন ছিল, যৌবন নিকুঞ্জে পাখীর কূজন যেদিন গানে গানে মুখরিত করলো তার মনের বনভূমি, সেদিন লুকিয়ে থাকা সেই সুর প্রতিধ্বনি হয়ে জেগেছিল তার কণ্ঠে, ভ্রমর গুঞ্জনের মতই গুন গুনিয়ে উঠেছিল। প্রথম যৌবনের সুধাভরা দিনগুলি তার ভালবাসা দেওয়া নেওয়ার উৎসব দিনের সানাইয়ের সুরে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল, সে কথা মনে পড়ে। কখন সে সুর ঘুমিয়ে পড়লো ? আর তো তার সাড়া পাওয়া যায় না।

একদিন রূপকথার রাজপুত্রের মত ঘুমন্ত সে সুরকে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জাগালো সুষম ; অচেতনকে চৈতন্য দান করলো, বাহিরের আলোয় তাকে আবিষ্কার করলো। গুণীর হাতের স্পর্শ পেয়ে জীবনবীণার তন্ত্রীগুলো প্রাণ পেয়ে স্পন্দিত হয়ে উঠলো, কিন্তু, সে সুর বাজলো কই যে সুরের প্লাবনে তার সমস্ত সত্বা নিজকে নিমগ্ন করে আত্মহারা হয়ে যেতে পারতো, যে সুরের আঘাতে তার সমস্ত জীবন সঙ্গীতময় হয়ে অহোরহ ঝঙ্কৃত হতে থাকতো।

তার মর্ম্মমূল থেকে আজ যে সুর উৎসারিত হলো স্বর্গ-অপ্সরীর চরণের নূপুর-শিঞ্জন সে নয়, বেদনার আনন্দলোকে তার জন্ম, আলোয় নয় অন্ধকারে, অশ্রুজলে যে পথের মাটি ভিজেছে সেই সিক্ত পথে, সঙ্গোপনে, নিভৃত অন্তর থেকে অন্তরলোকে তার যাত্রা।

ছায়াছবির জগতে তার প্রতিষ্ঠা আজ প্রেক্ষাগৃহকে জনসমাগমে পরিপূর্ণ করে। তার করুণ অভিনয়ের কারুণ্য দর্শকের চোখকে অশ্রুসজল ক'রে প্রেক্ষাগৃহকে করে তোলে প্রশংসার কলগুঞ্জনে গুঞ্জরিত ; অন্তরে যে তার প্রাণ আছে, কি বিপুল বেদনার সুগভীর স্পর্শ যে সেই অভিনয়কে অকৃত্রিম দরদ দিয়ে পর্দ্দায় রূপ দেয় তা শুধু সেই জানে। কিন্তু সুখী কি হয়েছে সে এই খ্যাতির জীবনে ? কিসে মানুষ সুখী হয়, কোন্ অজানার গোপন অন্তরালে, নিগূঢ় কোন্ অন্ধ গুহায় জীবনের কাম্য সুখ নিহিত থাকে লীলা তার সন্ধান জানে না। গভীর স্নেহে পরিপূর্ণ নিবিড় প্রেমে আতপ্ত শুধু একখানি ছোট ঘর একদিন সে চেয়েছিল, বিশ্বের খ্যাতির রাজ্যে আসন পাওয়া তো তার কল্পনায়ও কোনদিন আসেনি।

কোন কিছুই ভালো লাগেনা। যশ প্রতিষ্ঠায় বিতৃষ্ণা আসে, কিছুর মধ্যেই আকর্ষণ খুঁজে পায় না, এক এক সময় জীবন দুর্ব্বহ মনে হয়। সারা দিনের সকল কাজের অবসানে তার ক্লান্ত অবসন্ন আসল সত্বা রাত্রির অন্ধকারে, নির্ব্বাপিত-দীপ গৃহে, শয্যাতলে লুটিয়ে চোখের জলের মধ্যে আপনাকে ফিরে পায়। আর পারে না, লীলা আর এ কৃত্রিম জীবনকে বহন করতে পারে না।

সুষম কখন এসে গালিচার ওপরে তার পাশে বসেছে আত্মসমাহিত লীলা তা একটুও বুঝতে পারেনি। জানতে পারেনি সে কখন সন্তর্পণে তার কোলের ওপর থেকে সেতারটাকে

তুলে নিয়েছে। সুষম নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছিল। এক সময়ে লীলা চোখ মেলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সুষমের মুখের দিকে চাইলো, অর্থহীন ভাসা ভাসা সে দৃষ্টি, যেন এই মুহূর্ত্তে লীলা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে।

লীলা আস্তে আস্তে বললো 'সুষম বাবু, জানি আপনি শুনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন কিন্তু আপনাকে না বলে আর আমার চলে না, আমি আর কোন ফিল্মে নামবো না ঠিক করেছি। আমি বুঝতে পারছি যে এটা আমার পথ নয়। এতে আমার এতটুকুও আকর্ষণ নেই, আনন্দ নেই, ক্রমেই আমি অনুভব করছি যে আমি ভুল পথে চলেছি, এ পথ আমার জন্যে নয়।'

সুষম ভয়ানক চমকে উঠলো। একটুখানি স্তব্ধতার পরে বললো, 'লীলা, কেন তুমি এমন সংকল্প করেছ জানিনা, কিন্তু ফিল্ম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ফলেই বলছি যে এইটেই তোমার যথার্থ পথ ; তোমার এমন প্রতিভা যা এই অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দাও লীলা।'

'সুষম বাবু, শুধু প্রতিভার বিকাশেই কি জীবনে সার্থকতা আসে ? জানিনা জীবনের সার্থকতার রূপ কি, আমার মনে হয় মানুষের গোটা জীবনটাই এমন একটা সমস্যা যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন।'

একটু থেমে লীলা আবার বললো, 'অত্যন্ত সঙ্কটের মুহূর্ত্তে আপনি আমাকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে দিয়েছিলেন

সে কথা আমি জীবনেও ভুলবো না, কিন্তু আজ তিন বছরের ওপরে আমি এই পথে এসেছি, এক দিনের জন্যেও সুখী হইনি।'

সুষম লীলার কণ্ঠস্বরে নিগূঢ় বেদনার আভাস পেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকবার পর বললো, 'লীলা, আমি কখনও তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে চাই নি। হয়তো তোমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের সম্বন্ধে জানবার আমার কোন অধিকার নেই, হয়তো তোমার জীবনে এমন কোন গোপন দুঃখ আছে যা' তুমি আমার কাছে প্রকাশ করতে পার না, কিন্তু আমি কি এর কোন প্রতিবিধান করতে পারিনে ?'

লীলা বললো, 'না। এ কঠিন গ্রন্থি যিনি মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিই নিজহাতে বেঁধে দিয়েছেন, এর থেকে আমার মুক্তি নেই। আর,—আমার সম্বন্ধে জানাবারও এমন কিছু নেই, আমি পাবনা জেলার পলাশপুর গ্রামের একটি সাধারণ মেয়ে। অনেক মেয়েই যেমন তাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনা মেনে নিতে বাধ্য হয় আমিও তেমনি মেনে নিয়েছি, এর চেয়ে জানাবার আর কোন কিছু নেই।'

সুষম নিজের মনেই বললো, 'পলাশপুর ? পলাশপুরের পাশে রায়পুর আমাদেরও গ্রাম। শুনেছি অনেকদিন আগে পলাশপুরের জমিদারদের সঙ্গে রায়পুরের একটা বড় মামলা হয়। তুমি কি পলাশপুরের জমিদার পরিবারকে জানতে ?'

লীলা নতমুখে বললো, 'হ্যাঁ। ও সব ঘটনা আমিও শুনেছি।'

খানিকক্ষণ দু'জনেই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর লীলা বললো, 'সুষম বাবু, এই মূল্যহীন একটা জীবনের জন্যে আপনার নিজের কত মূল্যবান সময়ের যে অপচয় হয়েছে তা' আমি চোখের সামনে অসহায় ভাবে দেখেছি কিন্তু আপনাকে বাধা দিতে পারিনি। যে ঐশ্বর্য্যে আপনি আমার জীবন ভরে দিয়েছেন তার এককণা প্রতিদান দেবার সামর্থ্য আমার নেই। একদিন যখন আমি এখানে থাকবো না—'

সুষম সভয়ে বলে উঠলো, 'এসব কি কথা লীলা ?'

লীলা শান্তস্বরে বললো, 'বলছিলাম, দূর দূরান্তরে যেখানেই থাকি, আপনার জীবনের যে ক্ষতি করে গেলাম তার ব্যথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না।'

সুষম গাঢ়স্বরে ডাকলো 'লীলা !'

লীলা নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সুষম বললো, 'আমি মুখ ফুটে কখনও তোমাকে বলিনি, তোমার সাহচর্য্য আমাকে কত যে আনন্দ দেয়, জীবনের পথে তোমার সঙ্গকে যে আমি কত মূল্যবান মনে করি তা যদি জানতে।'

গভীর শান্তকণ্ঠে লীলা বললো, 'জানি আমি। আপনার সংযমকে আমি মনে মনে কত যে শ্রদ্ধা করি! সুষম বাবু, আপনি মানুষ নন্ আপনি দেবতা, তাই সেই শ্রদ্ধাই আপনাকে আমি দিয়েছি যা দেবতারই প্রাপ্য, মানুষের নয়।'

আঘাতকে সহনীয় করতে সুষম একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর ব্যথিত স্বরে বললো, 'লীলা, মাটির মানুষের মন দেবসম্মানে ভরে না, কিন্তু তোমার মত মেয়েকে ছোট গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে তোমার ব্যক্তিত্বকে আমি কখনও ছোট করতে চাই নি। যেদিন তুমি নিজে থেকে কাছে আসবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। থাক্ এ কথা,—এসো এখন আমরা বাজাই।'

কত বড় বেদনাকে যে সুষম সুরের আড়াল দিয়ে ঢাকতে চায় তা' লীলা অনুভব করতে পারে। এত বড় আঘাতকে সহ্য করবার মত দুর্জ্জয় মনের শক্তি সুষমেরই আছে তাও লীলা জানে, আরও জানে দেবতারও ব্যথার অনুভূতি সাধারণ মানুষের মতই একান্ত গভীর, মানুষের মন নিয়ে লীলা বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে।

সুষম সেতারের তারে মেঘমল্লার রাগে তান তুলেছিল। নিপুণ শিল্পীর হাতের যন্ত্র যেন জীবন্ত হয়ে সজল গম্ভীর সুরের এক অপরূপ মায়া দিকে দিকে বিস্তার করতে লাগলো, বর্ষণ-ক্লান্ত অশ্রুসিক্ত রাত্রি যেন সে সুরের সাগরে মগ্ন হয়ে গেল, আকাশ বাতাস পৃথিবীর সমস্ত সত্ত্বা অভিভূত, তন্ময়, নিশ্চল হয়ে স্থির হয়ে রইলো ; আর দুটি মুগ্ধ হৃদয়ের অবচেতনায় বাজতে থাকলো গভীর মেঘমল্লারের তানের মধ্যে বিরহের এক করুণ রাগিনী।

এক সময়ে কোন্ দূরের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। লীলা অনুভব করলো সেতারের ঝঙ্কার অনেকক্ষণ থেমে গেছে। চোখ মেলে সে দেখলো পাশে সুষম নেই, কখন সে উঠে চলে

গেছে, এক অসহনীয় নিগূঢ় বেদনার নির্ব্বাক সাক্ষী হয়ে সেতার খানি শুধু লীলার পাশে মূর্চ্ছিতের মত পড়ে আছে।

দুরন্ত ঝড়ের মতই যন্ত্রণার ঝড় লীলার মনের সব শৃঙ্খলা, শান্ত পরিবেশকে ভেঙ্গে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। বিনিদ্র সমস্ত রাত তার অশ্রুতে ভরে উঠলো। বিপুল ভালবাসার ঐশ্বর্য্য নিয়ে যে তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল সেই রাজ ভিখারীকে,—সেই অপরিমেয় প্রাণের সম্ভারকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে হল। ভিখারিনী সে, নিঃস্ব সে,—নিজের সুখ দুঃখের ছোট কারাগারে নিজেকে বন্দী করে রেখে দুর্ব্বল হৃদয়ের দৈন্যের ভারে যে ভেঙ্গে পড়ছে সাধ্য কি তার অন্তরের অজস্র দানে রাজাধিরাজের প্রসারিত করপুট পূর্ণ করে দেয়। প্রশস্ত তার ললাট, মহিমার কিরীট তার শীর্ষে, তার রাজাসন থেকে ক্ষুদ্র লীলার কাছে সে নেমে এসেছিল প্রার্থী হয়ে, তার কাছে সে কত ছোট তা লীলা জানে, তাই অক্ষমতার লজ্জা বেদনার তীর হয়ে তার বুকে বেজেছে।

কিন্তু, সুষমতো পারতো জোর করে কেড়ে নিতে তাকে, এ লীলা যে একান্ত ভাবে তারই সৃষ্টি। রাজোচিত অধিকারে সে বলতে পারতো, তুমি আমার, আমার তোমাকে চাই। তা' সে বলেনি, নিঃশব্দে ত্যাগ করে গেল তার অধিকার; লোকলোচনের অন্তরালে সরিয়ে নিল তার বঞ্চিত জীবনের দহন-দুঃখকে। কত বড় সে ত্যাগের মহত্ত্ব তার পরিমাপ করে লীলার সাধ্য কই? ক্ষমা কর দেবতা, অক্ষমাকে ক্ষমা কর তুমি, আমার চোখের

জলের প্লাবনে তোমার ব্যথার পাহাড় ক্ষয় হয়ে যাক্; তার অস্তিত্বের চিহ্ন টুকুও ধুয়ে যাক্, মুছে যাক্, তুমি শান্ত হও।

সুষম আসে। আগেকার মতই সহজ সে, মানসিক বিপ্লবের এতটুকু আভাস বাইরে প্রকাশ হতে দেয় না।

লীলা জানে, ঝড়ের মেঘ এমনি স্তব্ধ, এম্‌নি গম্ভীর। উদ্দাম ঝঞ্ঝার উন্মাদনাকে, কঠোর বজ্র বহ্নিকে অন্তরে ধারণ ক'রে কঠিন সংযম দিয়ে সে সংবরণ করে রাখে। কোন একদিন যদি তার সেই সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায় তবে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীর বুকে ভেঙ্গে পড়বে, সেদিন বজ্রের আগুনে দগ্ধ হয়ে যাবে, ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে বিশ্ব প্রকৃতি; তাই সুকঠোর তপস্যা তার আত্ম সংযমের।

বর্ষার ধারাবর্ষণের শেষে রিক্ত আকাশ লঘু নিঃশ্বাস ফেলেছে। মেঘমুক্ত শরতের আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে, বিগত বর্ষার স্নিগ্ধ আভাস যেন সে জ্যোৎস্নার গায়ে জড়িয়ে আছে।

রাত প্রায় দশটা। এই মাত্র সুষম চলে গেল। আজ সে লীলাকে একটা নতুন রাগ বাজাতে শেখাল, তারি সুর লীলার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করছিল। সুষমকে বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে লীলা দরজা বন্ধ করলো, তারপর সরে এসে সে অন্যমনস্ক ভাবে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। নারায়ণী নেই সুষমকে আর কেউ আদর করে খাওয়ায় না, লীলাকেও খাবার জন্যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অনুযোগ করবার

কেউ নেই। পরিচারিকা যথারীতি আসে, লীলা তাকে প্রায়ই ফিরিয়ে দেয়, আজও ফিরিয়ে দিয়েছিল।

জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশের দিকে চেয়ে লীলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। অতীত জীবনের যত ঘটনা ছায়া চিত্রের মত তার মনের পর্দ্দায় একে একে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, লীলা তন্ময় হয়ে ডুবে যায় তারই মধ্যে ;—এক সময় ঢং ঢং করে গির্জ্জার ঘড়িতে বারটা বাজলো।

অকস্মাৎ লীলার মনে হল কে যেন দরজায় করাঘাত করছে। এত রাত্রে দরজা খুলে দিতে লীলা দ্বিধা করছিল, ভাবছিল পরিচারিকাকে ডাকবে, হঠাৎ তার কানে এল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

কে এ? কার এ কণ্ঠস্বর! সহসাই লীলার মনে হল এ স্বর যে তার বহুদিনের পরিচিত। দূরাগত সঙ্গীতের মত সে ডাক তাকে এক নিমেষে পাগল করলো, ত্রস্ত হাতে দরজা খুলে দিয়েই আনন্দ বিস্ময় ভয় একসঙ্গে তার কণ্ঠে জড়িয়ে গেল, এ কি স্বপ্ন?

অস্ফুট উচ্চারণে সে যে কি বললো তা সে নিজেই শুনতে পেলো না। উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির অবিচল রঞ্জনের মুখের দিকে সে চাইতে পারলো না, অবশ দেহে মাটিতে বসে পড়লো।

কয়েক মুহূর্ত্ত তার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থেকে রঞ্জন তার হাত ধরে তুললো। লীলা মুখ তুলে এবার তার দিকে

চাইলো, দেখলো,—বিশৃঙ্খল রুক্ষকেশ, তপঃক্ষীণ দেহ এক সন্ন্যাসী এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে, লীলা স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে রইলো।

সন্ন্যাসী বললো, 'লীলা, অনেক কষ্টে তোমায় খুঁজে পেয়েছি।'

লীলা মনে মনে বললো, রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত কত যে তোমায় ডেকেছি রঞ্জুদা, তোমায় না পেলে আমার দিন যে আর কাটে না।

ঘরে এসে দুজনে পাশাপাশি বসলো। লীলা বললো, 'রঞ্জুদা, তোমার লীলাকে কি তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে?'

রঞ্জন বললো, 'ভুলিনি লীলা। পথে পথে ফিরেছি, নানাদেশের দুঃখী রঞ্জন অনাথিনী লীলারা আমার জীবনে এসে ভিড় করেছে, আকাশের ধ্রুবতারার মত তোমারই আলোর দিকে চেয়ে পথ চলেছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমাকে ভুলিনি লীলা।'

অনেক দিনের কথার সঞ্চয়ে দুজনের হৃদয় ভরে আছে কিন্তু কথায় বাল্যের সেই অজস্রতা আর নেই, নেই সে উচ্ছ্বাস। অল্প কথায়,—কিছু না বলায় সব কিছু বলা হয়ে যায়, জীবনের প্রবাহ আজ গভীর খাতে বয়ে চলেছে।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, আকাশে ভোরের আলোর আভাস দেখা যায়। রঞ্জন বললো 'লীলা, এখন আমায় যেতে হবে।' চমকে উঠে লীলা আর্ত্ত কণ্ঠে বললো, 'না, না, না, তোমায়

আমি কখনও যেতে দেব না, কোথায় যাবে তুমি ? এমন করে তুমি বাঁচবে না রঞ্জু দা।'

রঞ্জন কোন কথা বললো না। কোথায় তার যাত্রা,—কার উদ্দেশে তার এ অভিসার, তা রঞ্জন জানে না ; শুধু জানে তারই জন্যে রাত্রির অন্ধকারে ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে অন্তরের প্রদীপখানি জ্বালিয়ে ধরে মানব যাত্রীরা যুগ থেকে যুগান্তর পানে যাত্রা করেছে। শুধু জানে, দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা মাথায় ধরে, নির্যাতনকে বুক পেতে নিয়ে, জীবনের সব প্রিয় বস্তুকে অন্তরের হোমানলে অকাতরে ইন্ধন করে দিয়ে, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে যার পূজায় রক্ত পদ্ম অর্ঘ্য-উপহার দিতে হবে এ যাত্রা তারই কাছে। কে, সে, তা রঞ্জন জানে না, তাকে সে চেনে নাই, শুধু জানে তারই মহান গম্ভীর মঙ্গল ধ্বনি সমুদ্রে সমীরে শোনা যায়, নীল আকাশ ঘিরে তারই অঞ্চল প্রান্ত লুণ্ঠিত হতে থাকে, সেই নিরুপমা সৌন্দর্য্য প্রতিমার পদতলে জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পণ করে মানুষ সার্থক হয়।

রঞ্জন আস্তে আস্তে বললো, 'লীলা, মৃত্যু থেকে পুনর্জীবন পেয়েছি, তুমি আমার জন্যে ভয় করো না। নিজেকে নিয়ে বিলাস করবার আজ আর সময় নেই, আমাকে যেতেই হবে লীলা।'

'তবে আমাকেও সঙ্গে নাও, আমাকে ফেলে যেওনা রঞ্জুদা।'

রঞ্জনের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, 'পারবে ? পথের কাঁটায় দুই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে, কাঁটা গাছে

শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে যাবে, অনেক কষ্ট অনেক আঘাত অনেক বেদনা পথে পথে আছে, তুমি কি সহ্য করতে পারবে? এ ছন্নছাড়ার ঘর নেই, আত্মীয় নেই, আরাম নেই, বিশ্রাম নেই, এই ছন্দহীন জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে তুমি?'

'পারবো রঞ্জুদা, তোমার শক্তিতে শক্তি সঞ্চয় করবো, তোমার হাত ধরে পথ চলবো, আমায় ফেলে যেও না। জীবনে আমার যত জালজঞ্জাল জড়িয়ে গেছে তার থেকে আমায় তুমি মুক্ত করে নাও, আমায় বাঁচাও রঞ্জু দা।'

লীলার কণ্ঠস্বরের অসীম আকুলতা যেন বাতাসকে উচ্ছ্বসিত করে দিকে দিগন্তে, জ্যোৎস্নামগ্ন আকাশে ব্যপ্ত হয়ে গেল।

রঞ্জন বললো, 'তবে প্রস্তুত হয়ে থেকো। জানিনা কবে আবার আসবো, কিন্তু যেদিন আসবো সে দিন যেন তোমায় পাই।'

লীলা আস্তে আস্তে রঞ্জনের পায়ের কাছে মাথা নত করলো, তার দুই চোখের অজস্র ধারা রঞ্জনের পা দুটিকে সিক্ত করে দিল।

ধীরে ধীরে তার দুই হাত ধরে রঞ্জন তাকে তুললো, সন্তর্পণে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা একবার বুকে চেপে ধরলো, তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়লো। রাত্রি শেষের জনবিরল পথে রঞ্জনের মূর্ত্তি দূর থেকে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল, অপলক দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে চেয়ে নিশ্চল নিথর প্রতিমার মত লীলা দাঁড়িয়ে রইলো।

একদিন সকাল বেলা সুষম এসে দেখলো লীলা ঘরে নেই। সব ঘরে তাকে খুঁজে কোথায়ও না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলো, কখন সে চলে গেছে, কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। সহসা চোখে পড়লো টেবিলের ওপর কাঁচের পেপার ওয়েটের নীচে একখানা খাম চাপা রয়েছে। সুষম রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেখানা খুলে পড়লো।

লীলা লিখেছে,—

'জানিনা শ্রদ্ধা আর ভালবাসা এ দুয়ের মাঝখানকার সীমারেখা কোন খানে। যাঁর মনের সঞ্জীবনস্পর্শ পেয়ে একদিন মৃত্যুসাগর উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, আমার সেই মর্ত্ত্যলোকের এক মাত্র দেবতার পায়ে রেখে গেলাম আমার পরিপূর্ণ অন্তরের অসংখ্য প্রণাম।

অনেক দিনের প্রতীক্ষার অবসানে রঞ্জুদার সঙ্গে চললাম, জানিনা এ অনির্দ্দিষ্ট দুর্গম পথ যাত্রার শেষ কোথায়।'

বজ্রাহত শাল তরু অকম্পিত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সমাপ্ত।